ঈদুল আজহা

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

১৩১৯ হিজরী

ঈদল আজহা।

حجاب چهره جان میشود غبار تنم ٭
خوش آن دم که ازین چهره پرده بر فگنم ٭
چنین قفس نه سزاے من خوش الحانست ٭
روم به روضهٔ رضوان که مرغ آن چمنم ٭

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী
প্রণীত।

১৩১৯ হিজরী।
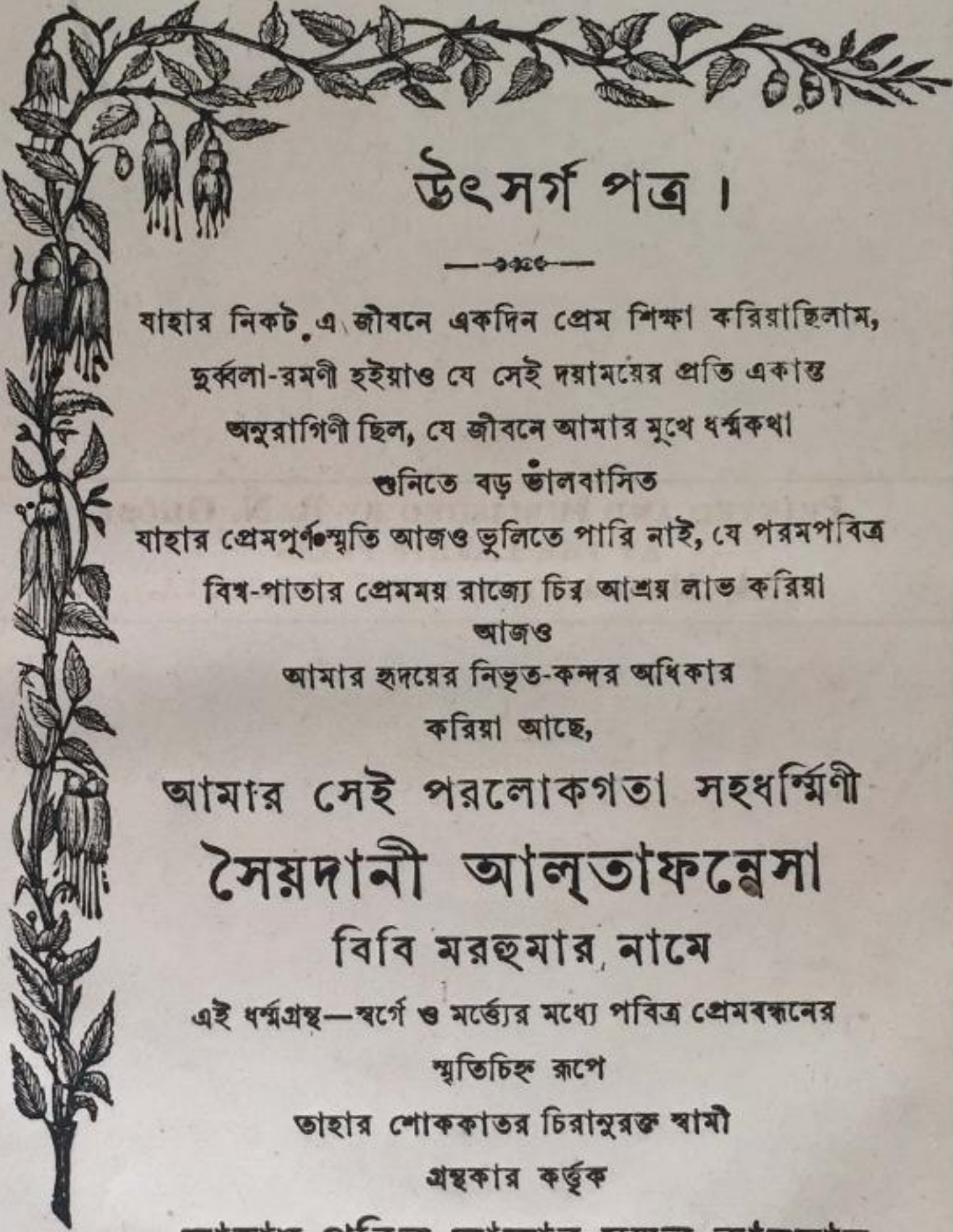
মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

যাহার নিকট এ জীবনে একদিন প্রেম শিক্ষা করিয়াছিলাম,
দুর্ব্বলা-রমণী হইয়াও যে সেই দয়াময়ের প্রতি একান্ত
অনুরাগিণী ছিল, যে জীবনে আমার মুখে ধর্ম্মকথা
শুনিতে বড় ভালবাসিত
যাহার প্রেমপূর্ণ স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই, যে পরমপবিত্র
বিশ্ব-পাতার প্রেমময় রাজ্যে চির আশ্রয় লাভ করিয়া
আজও
আমার হৃদয়ের নিভৃত-কন্দর অধিকার
করিয়া আছে,
আমার সেই পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী
সৈয়দানী আল্‌তাফন্নেসা
বিবি মরহুমার নামে
এই ধর্ম্মগ্রন্থ—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যের মধ্যে পবিত্র প্রেমবন্ধনের
স্মৃতিচিহ্ন রূপে
তাহার শোককাতর চিরানুরক্ত স্বামী
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
তাহার পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনায়
উৎসর্গিত হইল।

সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির উদ্দেশ্য।

পুস্তকের নানা স্থানে কতকগুলি সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতাগণের অবগতির জন্য উক্ত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির প্রয়োগ-প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল, অর্থাৎ তাঁহারা যে স্থানে উক্ত অক্ষর দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানে নিম্নলিখিত রূপে পাঠ করিবেন।

দং বা দ—দরুদ=সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লামা—

আমাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম উল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী (দরুদ) উচ্চারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য।

আ—আলায়হেস্ সালাম—

অন্য যে কোন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী উচ্চারণ করিতে হয়।

রজিঃ—রদি আল্লাহো আন্হ—

সাহাবাগণের নামোল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী উচ্চারণ করিতে হয়।

রহঃ—রহমতুল্লহ আলায়হে—

অন্যান্য ধর্ম্মাত্মা ও আলেমগণের নামোল্লেখ করার পর উপরি উক্ত শব্দ কয়েকটী উচ্চারণ করিতে হইবে।

সূচিপত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

কোরবানী ।

ভূমিকা।

—০ঃ০—

পুস্তক লিখিতে হইলেই একটী ভূমিকা লেখা আবশ্যক হয়। সকল পুস্তকের প্রথমেই একটী ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিকা না থাকিলে অনেক স্থলে পুস্তকখানি যেন অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হয়। পাঠকবৃন্দ পুস্তক হাতে লইয়াই তাহার ভূমিকা আছে কি না, তাহাই প্রথম দেখিয়া থাকেন। ভূমিকায় থাকে কি? কোন কোন ভূমিকাতে পুস্তকের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত থাকে—আর কোন স্থানে গ্রন্থকারের পরিচয় তন্মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। কাজেই ভূমিকায় উপযুক্ত গ্রন্থকারের পরিচয় পাইলে অথবা বিষয়টী পাঠের উপযুক্ত কি না বিবেচিত হইলে পাঠকের তাহা পড়িতে আগ্রহ হয়। এই আগ্রহের মুখে পুস্তক খানা অনেকেই পড়িয়া ফেলেন,

অন্ততঃ অভাবপক্ষে পাতা উল্টাইয়া বাদসাদ দিয়াও কিছু পড়িয়া থাকেন। এই জন্য নব্য পাঠকগণ সোৎসুক-দৃষ্টিতে ভূমিকার অনুসন্ধান করেন এবং ভূমিকা না থাকিলে অনেক সময় কেবল পাতা উল্টান পর্য্যন্তই হয়। এ জন্যই এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিতে হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূমিকায় যাহা লিখিতে হইবে তাহারই অভাব। কারণ সাহিত্য-সংসারে আমার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা নাই। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষমতা আমার নাই, এবং যে বিষয়টী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাও ধর্ম্ম-বিষয়ক। সুতরাং উহাতে যে নব্য পাঠকগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সে আশা অতি অল্প। এই মাত্র বলিতে পারি, আহারান্তে যাঁহাদের নিদ্রা আসে না, তাঁহারা উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, এই পুস্তক খানি পাঠ আরম্ভ করিলে, বোধ হয় অনিদ্রার প্রতিকার হইতে পারে।

এই আমার পুস্তক প্রণয়নের প্রথম উদ্যম।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার যখন এ ক্ষমতা নাই তখন এ কার্য্যে কেন ব্রতী হইলাম? যে ক্ষেত্রে ও যে ভাবে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে তাহাই পাঠককে অবগত করাইলে ইহার আর স্বতন্ত্র উত্তর দিতে হইবে না।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃর্গত, ধনবাড়ী নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আমার বাসস্থান। উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভাল "ঈদগাহ মাঠ" নাই। সামান্য যাহা আছে-তাহাকে প্রকৃত ঈদগাহ মাঠ বলা যাইতে পারে না। কারণ সামান্য দুই চারি গ্রামের লোক তথায় মিলিত হইয়া ঈদের নামাজ পড়িয়া থাকে। অনেক গ্রামে যে সকল ক্ষুদ্র মস্জেদ আছে, তাহাতেও 'ঈদের' নামাজ পড়া হয়। ধনবাড়ী গ্রামেও একটি ক্ষুদ্র মস্জেদে ঈদের নামাজ পাঠ হইত। আমার একটি "ঈদগাহ" মাঠ স্থাপনের ইচ্ছা হওয়ায়, এবং পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের লোক তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করায়, ১৩০৩ সালে আমি ধনবাড়ী গ্রামে একটি "ঈদগাহ মাঠ"

স্থাপন করি। ঐ মাঠে প্রথম "ঈদল আজহার" নামাজ হয়। সেই 'জমাতের' লোক অনেকেই আমাকে 'এমামতি' করার জন্য অনুরোধ করায়, (যদিচ আমি এমামের উপযুক্ত নই) বাধ্য হুইয়া আমাকেই এমামতি করিতে হইয়াছিল। সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল, খোৎবা—যাহা নামাজ অন্তে পাঠ হয়, তাহা আরব্যভাষায় লিখিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে আরব্য ভাষা বুঝিতে সক্ষম লোক অতি অল্পই দেখা যায়। বিশেষতঃ ঐরূপ ক্ষুদ্রপল্লী সমূহে আরব্যভাষা দূরে থাকুক, পার্শী বা উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ লোকও অতি বিরল। সুতরাং আরবী খোৎবা অনেকেরই বোধগম্য নয় অথচ উহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ উহাতে 'কোর-বানী ও ঈদের' সময় যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়া থাকে। এই আচরণীয় বিষয়গুলি না বুঝিলে, 'ঈদের' নিয়মাবলী প্রতিপালিত হইতে পারে না। উহা অবগত হইয়া ঐ বিধান গুলি

লোকে প্রতিপালন করিবে বলিয়াই 'খোৎবাতে' উহা পাঠ হয়। কিন্তু আরবীভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। বাঙ্গালা ভাষাই এক্ষণে আমাদের মাতৃভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও আরবী, পারসী ভাষা না জানিলে ধর্ম্ম বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তবুও ধর্ম্মভাব এতই শিথিল হইয়াছে যে, ঐ ভাষা শিক্ষা করা এক্ষণে লোকে কর্ত্তব্য মনে করেন না। ইংরাজী রাজভাষা ও বাঙ্গালা দেশভাষা, সুতরাং আজীবন এই দুই ভাষারই আলোচনা করেন। 'খোৎবার' উদ্দেশ্য সফল করার মানসে, আমি প্রথমতঃ সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের বিধান বা মসলাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করি, তৎপর আমার মনে হয় "ঈদ" বিষয়টী কি? ঈদের আনন্দই বা কেন হয়? "কোরবানী" প্রথা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, কোন্ ঘটনা হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে? এ সকল বিষয়ও অনেকে অবগত নয়,

সুতরাং তাহাও লিখিয়া উহাতে যোগ করি। পরে সেই ঈদগাহ মাঠে 'নামাজ ও খোৎবা' অন্তে সমাগত উপাসকমণ্ডলীকে উহাই শ্রবণ করাই। সকলেই উহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করেন। আমার কতিপয় বন্ধু উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি কখনও কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করি নাই, এবং নিজকেও এই গুরুতর কার্য্যের উপযুক্তও মনে করি না। সুতরাং সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। কয়েক মাস পর "মিহির ও সুধাকরের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শেখ আব্দুর রহিম সাহেব উল্লিখিত বিষয়টি সুধাকরে প্রকাশ করার জন্য আমার নিকট চান এবং আমার আংশিক অসম্মতি সত্বেও তিনি উহা লইয়া "ঈদকাহিনী" নাম দিয়া সুধাকরে প্রকাশ করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এই প্রবন্ধ অনেকে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়া-ছিলেন বলিয়া, আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে পুস্তকাকারে উহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ

করেন। বিশেষতঃ মিহির ও সুধাকরের সম্পাদক সাহেব, ঐ পুস্তক গ্রাহকগণকে উপহার দিবেন বলিয়া "মিহির ও সুধাকরে" বিজ্ঞাপন দেওয়ায় উল্লিখিত বিষয়টি আমাকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

সুধাকরের প্রকাশিত প্রবন্ধ, সম্পূর্ণরূপে ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জিত নহে—আমার এরূপ একটী ধারণা জন্মিয়াছিল। এই জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের পূর্ব্বে, উহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করার মানসে—'তফসির' (কোরাণ শরিফের টীকা), 'তারিখ' (ইতিহাস) এর সহিত মিলাইয়া দেখিতে গিয়া ভয়ানক গোলযোগে পতিত হই। প্রথমে যে সময় এই বিষয়টী লিপিবদ্ধ করি, তৎকালে ঐরূপ তন্নতন্ন করিয়া দেখিবার সময় পাই নাই। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে একটা ঘোরতর পার্থক্য আছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই, পাঠক-

বর্গের মনোযোগ ইহাতে বিশেষরূপে আকর্ষিত হইবে ও তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এতন্মধ্যস্থ বিষয় গুলির স্বাধীন আলোচনা করিবেন ও দোষগুণের বিচার করিবেন—এই ভাবিয়া, পুস্তকের আদ্যো-পান্ত পরিশোধিত করিতে প্রবৃত্ত হই। প্রথম লেখার সময়ে দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া দেখার সময় পর্য্যন্ত পাই নাই, কিন্তু, এতৎসম্বন্ধে এক্ষণে সময়ও যথেষ্ট—এই ভাবিয়া পুস্তকখানিকে পরিশোধিত করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম—পুস্তকোল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের ধর্ম্ম বিষয় লিখিতে গিয়া প্রায়ই এইরূপ সংকট-কেন্দ্রে পড়িতে হয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া এত মতভেদ—যে তাহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা ভ্রমপূর্ণ, তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাকেও সেই বিপদে পড়িতে হইয়াছে।

হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লা যে তাঁহার প্রিয় পুত্রকে খোদাতালার আদেশে কোরবানী করিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ কোরাণ শরিফে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—সুতরাং সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। বিচার্য্য হইতেছে—তাঁহার পুত্রদ্বয় মধ্যে কোন্ পুত্রকে তিনি কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—সেই বিষয়। কেহ বলেন, হজরত এসমাইল (আ), কেহ বলেন, হজরত এছহাক (আ)। এ গ্রন্থে হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ আছে এবং কোন্ কোন্ পণ্ডিত কোন্ পক্ষ সমর্থন করিয়া কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইহার পরিশিষ্টে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

সুধাকরে "ঈদ্‌কাহিনী" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই "ঈদল-আজহা" নাম দিয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার যে অংশ কোরাণ শরিফের টীকায় প্রকাশ নাই, তাহা পরিত্যক্ত

হইয়াছে। অনেক স্থানে কোরাণ শরিফের টীকা দৃষ্টে পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধন করা গিয়াছে। যাঁহারা "সুধাকরে" ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কোন্ কোন্ অংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"ঈদকাহিনী" প্রবন্ধে যে মসলা বা বিধানগুলি লিখিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহাও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে। মসলা সম্বন্ধে আমাদের সোন্নত জামাতের চারি মজহাবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যিনি যে মজহাবলম্বী, তাঁহার প্রতি সেই মজহাবের বিধান পালনীয়। আমাদের দেশের প্রায় সমুদয় লোকই হানিফী মজহাব অবলম্বী বিধায়, এ গ্রন্থে কেবল ঐ মজহাবের বিধানই লিখিত হইয়াছে।

আমার আরবী-অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সালার গ্রামনিবাসী, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হজরত মৌলানা আবুল ফজল মহাম্মদ সাদউদ্দিন

সাহেব ও তদীয় সহোদর, প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত মৌলবী হাকিম আবু মনসুর মহম্মদ আবদুল হক মোহাদ্দেস সাহেব, এই পুস্তক প্রণয়ন কালে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তি গুলির বিশদব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ধর্ম্মই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম্মই আমাদের ইহলোকে ও পরলোকে সহায়। এ নশ্বর জগতে ধর্ম্মই সত্য ও অবিনশ্বর। "ঈদপর্ব্ব" মুসলমান সম্প্রদায়ের একটী প্রধান আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম। এই বিষয় ভাষান্তরিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে, আমার যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে, পাঠকগণ আগ্রহের ও সহিষ্ণুতার সহিত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল বোধ করিব। ইতি—

দীনাতিদীন,

সৈয়দ নওয়াব আলী।

মঙ্গলাচরণ।

بسم الله الرحمن الرحيم *

الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و اصيلا *

اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي و انا عبدک
ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا
فانه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي
لاحسنها الا انت و اصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا
انت لبيک و سعديک والخير كله في يديک *

اللهم صل على محمد عبدک و رسولک النبي الامي
و على آل محمد و ازواجه و ذريته كما صليت على
ابراهيم و على آل ابراهيم و بارک على محمد النبي الامي
و على آل محمد و ازواجه و ذريته كما باركت على ابراهيم
و على آل ابراهيم في العالمين انک حميد مجيد *

করুণাময় দয়ালু খোদাতালার নামে গ্রন্থারম্ভ করিতেছি।

সেই অসীম, অনাদি, অনন্ত, জ্ঞানময়, জ্যোতির্ম্ময়, ইচ্ছাময়, চৈতন্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান জগতপাতা সৃজনকর্ত্তা আমাদিগকে সৃজন করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন জন্য নবিগণকে মর্ত্তে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি হজরত এবরাহিম(আ) কে "খলিল" অর্থাৎ সুহৃদ সম্বোধন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র হজরত এসমাইল (আ)কে তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করার আদেশ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার হৃদয়ে এই কঠোর পরীক্ষার সময়ে অমানুষিক দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যপ্রবণতার সঞ্চার করিয়াছিলেন, যাঁহার আদেশবাণীতে অমানুষিক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এবরাহিম (আ) তাঁহার নিজের একমাত্র

প্রিয়তম পুত্র হজরত এসমাইলের (আ) কোমল-কণ্ঠে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যিনি স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ে এই কঠোর পরীক্ষার সময় অসাধারণ কর্ত্তব্যবোধ, অনন্তভক্তি, দৃঢ়বিশ্বাস ও অকুতোভয়তার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, আবার যিনি করুণা প্রকাশে হজরত ইসমাইলের (আ) জীবনরক্ষার জন্য স্বর্গীয় দোম্বা প্রেরণ করিয়া ভক্তের প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলেন, যিনি হজরত এসমাইল (আ) কে 'জবেহুল্লা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া 'নবূয়ত' প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার দয়ায় আমরা শেষ নবি হজ-রত আহমদ মোজতবা মহাম্মদ মোস্তফা (দ) র 'ওম্মত' হইয়াছি ; এ হেন করুণাময় দয়ালু খোদা-তালার মঙ্গলময় জয়োচ্চারণে এই গ্রন্থারম্ভ করিলাম। যাহা কিছু পবিত্র, সৎ, সত্য ও প্রশংসনীয়—যাহা কিছু অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অনুপম—তাহাই তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি অনুপমেয়, তিনি অসীম, তিনি অনাদি, তিনি

অনন্ত, তিনি সর্ব্বগুণাধার, তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি দয়ার প্রেমপ্রস্রবণ, তিনি ভক্তবৎসল, তিনি হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, জ্যোতিঃ হইতেও জ্যোতির্ম্ময়, মহৎ হইতেও মহান্, গৌরব হইতেও গৌরবান্বিত। তাঁহার প্রশংসা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু কীট মানব আমি, কোথায় আমার শক্তি, কোথায় আমার হৃদয়ের প্রেম-প্রবণতা, কোথায় আমার তাঁহার গুণগ্রাহিকাশক্তি। এই আসমুদ্র পর্ব্বত-মেখলা—নদ নদী, গিরি প্রস্রবণ পূর্ণ শস্যশ্যামলা, ধরিত্রী সবই তাঁহার। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তাহার এক কোণে দীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া। তিনি একমাত্র উপাস্য, একমাত্র প্রণম্য।

তাঁহার পরই হজরত মহম্মদ মোস্তফা (দ) যাঁহাকে তিনি শেষ পয়গাম্বর করিয়াছেন, সকল নবি, অপেক্ষা সম্মানিত করিয়াছেন, যাঁহার জন্য সকল বস্তু সৃজিত হইয়াছে, যিনি পরকালে আমাদের মুক্তি প্রার্থী হইবেন, সেই শেষ নবি হজরত এবরাহিম (আ) ও হজরত এসমাইল

(আ) এর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই অনুকরণ করিয়া কোরবাণী প্রথা—যাহা লোপ পাইয়াছিল, প্রচলিত করিয়াছেন, সেই কোরবানী, হজ ও ঈদের পবিত্র আনন্দে সমগ্র জগতের সর্ব্ব প্রদেশের মোসলমান ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে প্রীতির উৎস, পবিত্রতার প্রস্রবণ, আনন্দের প্রবলোচ্ছ্বাস বহিয়া থাকে, সেই পবিত্র উৎসবের সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত, সেই সর্ব্বশক্তিমানের নামোচ্চারণ করিয়া আরম্ভ করিতেছি।
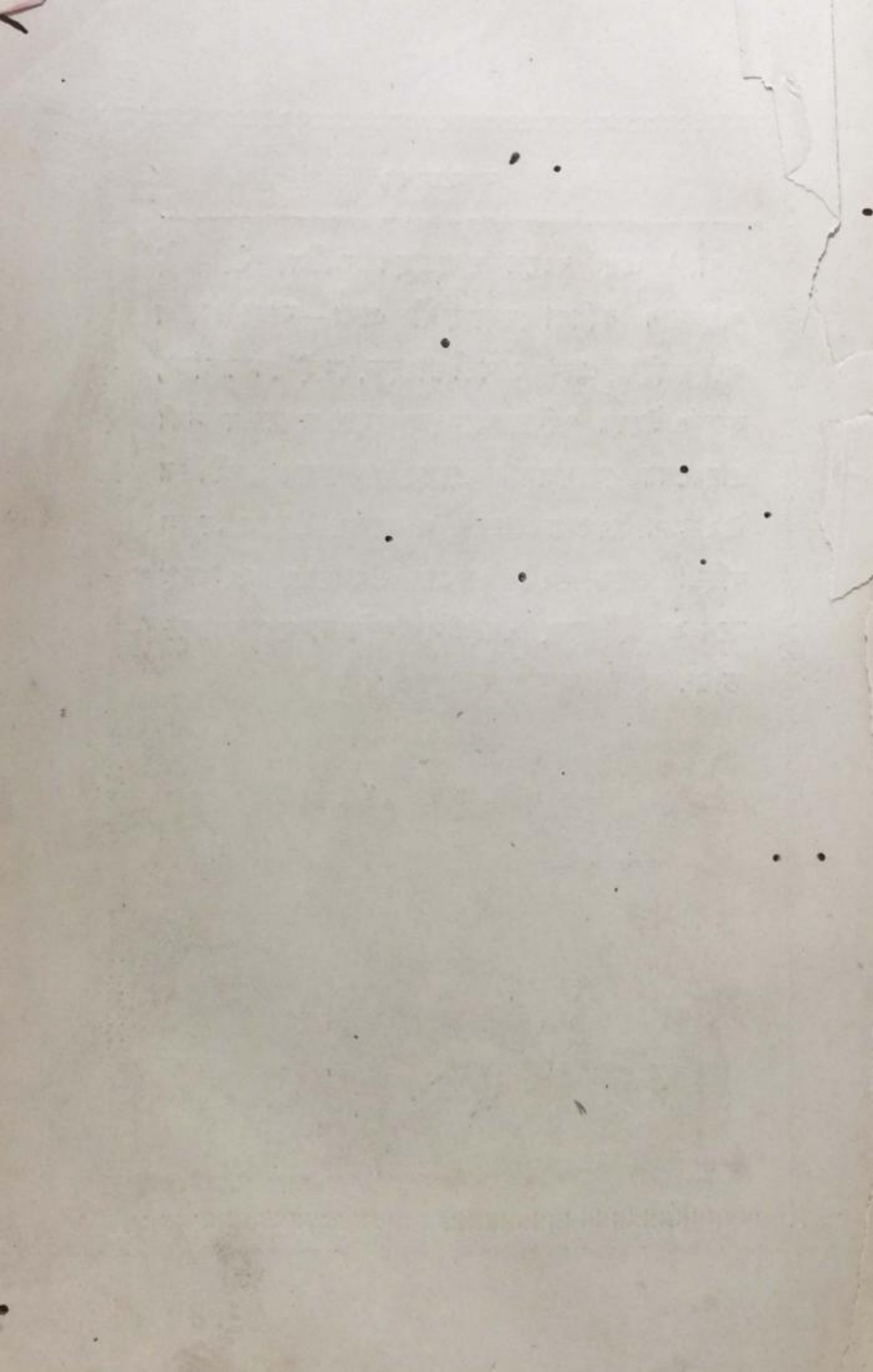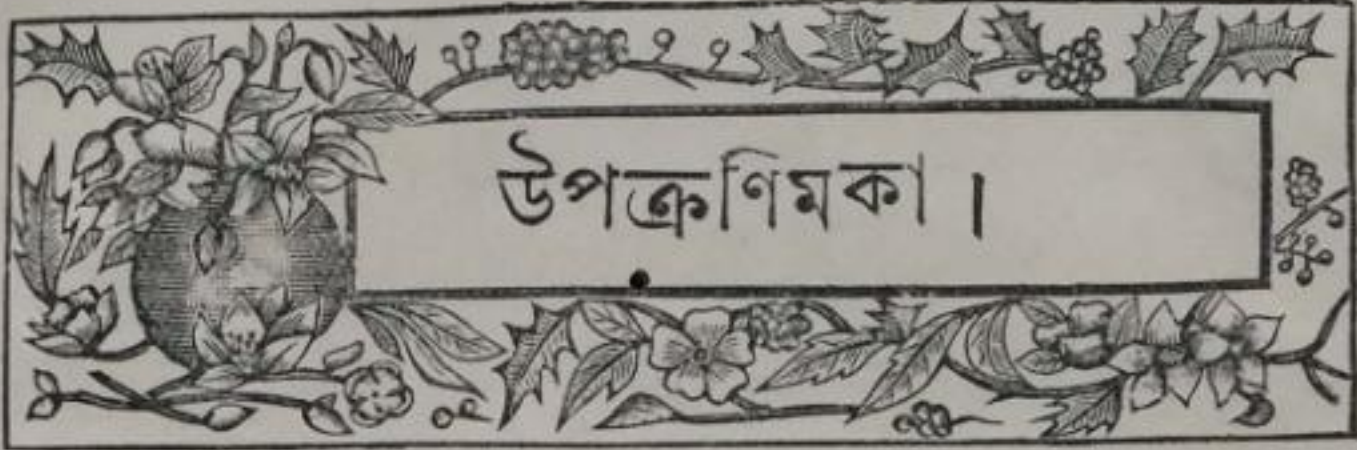
উপক্রমণিকা।

* الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر و لله الحمد *

,,الا ليت شعري هل ابيتن ليلة *
بواد و حولي اذخر و جليل *
و هل اردن يوما مياه مجنة *
و هل يبدون لي شامة و طفيل *،،

بلال رضي الله عنه *

ঈদের আনন্দের সংক্রামকতা আছে। সকল মুসলমানের প্রাণ ইহার উচ্ছ্বাসে নাচিয়া উঠে। "ঈদ" শব্দের অর্থই "আনন্দ"। এই দিনে আনন্দ প্রকাশ করা প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান মুসলমানেরই কর্ত্তব্য। এই ঈদকে 'ঈদল আজহা' বলে। আনন্দই ঈদোৎসবের মূলমন্ত্র, কিন্তু এ আনন্দ

কিসের? ইহা পবিত্র হজের (১) আনন্দ—যে পঞ্চ প্রবল স্তম্ভের উপর মুসলমানধর্ম্ম সম্প্রতিষ্ঠিত, হজ তাহারই অন্যতম।

এই দিন কি আনন্দের—দেখ দেখি ভাই! শত সহস্র মুসলমান—দেশ, নগর, গ্রাম, পল্লী ছাড়িয়া, কতশত নদ নদী, গিরি প্রস্রবণ ও প্রান্তর পার হইয়া—কি এক অদম্য অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে পরিচালিত হইয়া—কি এক অজানা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া প্রাণের টানে এই পবিত্র হজের জন্য, আরবের সেই মরুময় কর্কশ প্রান্তরে উপস্থিত হয়। এত পথকষ্ট, এত শারীরিক অবসাদ এত পরিশ্রমের কঠোরতা, পরিজন বিচ্ছেদের—স্বদেশ বিরহের—এত যে ভীষণতা, সবই তাহারা ভুলিয়া যায়। অকুল সমুদ্রে ভাসিয়া শত শত বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া তাহারা কেন বল দেখি, সে সুদূর আরবে দয়াময়ের পবিত্র মন্দিরের প্রদক্ষিণ ও হাজারুল আসওয়াদ (২) (কৃষ্ণ

১। পরিশিষ্ট দেখ। ২। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রস্তর চুম্বন) করিতে যায়? ইহা কি "হজের" পবিত্র আনন্দোপভোগের প্রবল বাসনা পরিচালিত নহে?

যাহারা ধর্ম্মপ্রাণতায় ভুলিয়া এই পবিত্র উৎসব উপভোগের জন্য, আরবের মরুময় প্রান্তরে দয়াময়ের মন্দির উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়, তাহারাই ধন্য! যাহারা এই পবিত্র সময়ে—তাঁহার পবিত্র গৃহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সুখ উপভোগ করে, অত্যুন্নত, অতিপবিত্র, অদ্ভুতকাহিনীময় "এলামলাম" (৩) পর্ব্বত দর্শন পূর্ব্বক উল্লাসে ও উৎসাহে "এহরাম" (৪) বাঁধিয়া পবিত্রধামে উপনীত হয়, তাহাদের কতই না সৌভাগ্য! কতই না আনন্দের দিন!! এ পবিত্র আনন্দের কি তীব্রতেজ দেখ দেখি! কোথায় তোমার দেশ, কোথায় তোমার জন্মপল্লী, কোথায় বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী পুত্র ও প্রিয়-পরিজন! কিন্তু আজ কি এক জ্বলন্ত উৎসাহ—অদম্য প্রীতি ও পবিত্রতা তোমার এই ক্ষুদ্র

৩। পরিশিষ্ট দেখ। ৪। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রাণকে টানিয়া টানিয়া, আরবের পবিত্রক্ষেত্রে দয়াময়ের পবিত্র মন্দিরের আবরণ চুম্বনের জন্য উপস্থিত করিয়াছে। তোমাকে সামান্য অসার সাংসারিক প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়া সেই পরম পবিত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়ের পবিত্রপ্রেমে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

ধর্ম্মময় জীবনই প্রকৃত জীবন, ধর্ম্মহীন জীবনের অস্তিত্ব অসার। ধর্ম্মময় জীবনের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ—সংসারে আমরা যাহাকে আনন্দ ও সুখ বলি—তাহা ধর্ম্মজনিত আনন্দের অতি দূরবর্ত্তী ক্ষীণকায় ছায়ামাত্র। পার্থিব আনন্দ ও ধর্ম্মজনিত আনন্দে কত পার্থক্য দেখ দেখি! তুমি, আমি হয়ত এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, সুশীতল পানীয় ও সুখকর ভোজন লইয়া নির্জ্জন কক্ষে, অলসতার ক্রোড়ে ডুবিয়া, নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতেছি—না হয়, একটু মাত্র উৎসবের মৌখিক আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া একটু না হয় হাস্যবদন হইয়াছি। হয়ত ভোজের আমোদে বন্ধু

বান্ধবকে লইয়া, মহা কোলাহলের সহিত সহাস্য মুখে নানাবিধ সুপাচ্য অন্নব্যঞ্জন লইয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছি—কিন্তু কল্পনার সহায়তায় একবার আরবের মরুময় প্রান্তরোপান্তে উপস্থিত হইয়া দেখ দেখি! ঐ যে দলে দলে হাজিগণ এই ভীষণ রৌদ্র, মরুভূমির জ্বলন্ত বাতাস ও তরঙ্গায়িত ঝটিকা মাথায় করিয়া যষ্ঠি হস্তে দ্বিগুণ উৎসাহে—আরও দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতেছেন; ঐ সকল সৌম্যমূর্ত্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আদর্শ, ধর্ম্ম প্রাণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুণ্যব্রত হাজিগণ দেখ দেখি ভাই কি ঘোর উৎসাহেই আজ মাতিয়াছেন, কি অপূর্ব্ব আনন্দই না ভোগ করিতেছেন। আজ প্রকৃতপক্ষে ইহাঁদেরই সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন। ইহাঁরাই প্রকৃত ইসলাম সন্তান এবং ইহাঁদের জন্ম ও জীবন সার্থক।

ইহাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তার পবিত্র গৃহ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছেন, পবিত্র কাবা (৩)

৩। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রদক্ষিণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন—হজরুল আস্‌ওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করিয়া পাপমুক্ত হইয়া এ নশ্বর জীবন সার্থক করিয়াছেন। জমজম কূপের (৪) বিমল পবিত্র জল পান করিয়া, পাপ ও রোগ মুক্ত হইয়া, প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শীতল করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ হাজি—ধর্ম্মানুপ্রাণতায় উন্মত্ত হইয়া আঁরাফাত (৫) পর্ব্বতে একত্র মিলিত হইয়া তকবির (৬) ধ্বনিতে সেই পবিত্র ভূমি পরিকম্পিত করিতেছেন—এবং পাপমুক্ত হইয়া অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই উন্নতকায় বিশালদর্শন গগনস্পর্শী পর্ব্বত-সানুদেশে—শত শত ধর্ম্মানুরাগী সাধুবৃন্দের সম্মিলনের সুখ যে না দেখিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা।

ইহা ব্যতীত ফেরেস্তাগণও 'লব্বায়েক' (৮) শব্দে সুনীল মেঘরাগরঞ্জিত গগনতল পরিপূরিত করিয়াছেন—এবং দয়াময় খোদাতালাও 'লব্বা-

৪। পরিশিষ্ট দেখ ৫। পরিশিষ্ট দেখ ৬। পরিশিষ্ট দেখ। ৮ পরিশিষ্ট দেখ।

য়েক' শব্দ সম্বোধনের উত্তর দিয়াছেন। ধন্য সেই পবিত্রাত্মা ইসলাম্ রমণীগণ!—যাঁহারা এই ধর্ম্মপ্রাণ হাজিদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া সুপবিত্রা হইয়াছেন। ধন্য সেই সব সদাচরণশীল মুসলমান—যাঁহাদের ঔরসে এই সমস্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই সুদূর প্রান্তর মধ্যে নির্জ্জন পর্ব্বতের অতি নির্জ্জন শিখরদেশে সেই অতুলশক্তিসম্পন্ন জগতের একমাত্র জ্যোতিঃ স্বরূপ দয়াময়ের নিকট যখন এই সমস্ত পবিত্রচেতা হাজিগণ তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, আত্মীয়, পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরগণের জন্য যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন—তাহা অবশ্যই তাঁহারা পাইয়াছেন। আমরাও যে সেই পুণ্যক্ষেত্রের পবিত্র প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা নহে—আমাদের জন্যও সেই সব পবিত্রমনা হাজিদের প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহারা

لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات *

বলিয়া আমাদের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমাদের এই অবনত মস্তকে পরিবর্ষিত—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ভাই সকল! আজ এত দূরে থাকিয়াও আমাদিগকে বিমল উৎসবানন্দে পূর্ণোৎসাহে মাতিতে হইবে। সেই পাপমুক্ত হাজিগণের মধ্যে—কত পবিত্রমতি আওলিয়া (৯), আওতাদ (১০), কোতব (১১) ও গওস (১২) আছেন—তাঁহারাও আমাদের জন্য খোদার নিকট আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাঁদের আন্তরিক সরল প্রার্থনায় যে আমাদের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে—সেই মঙ্গল আশীর্ব্বাদের সহায়তায় আমরা যে পারলৌকিক ও পার্থিব সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে আবার এই ষড়ঋতু সম্বলিত বৎসরের প্রত্যেক মুহুর্ত্ত নিরাপদে অতিবাহিত করিতে পারিব—ইহা ভাবিয়াই

৯। পরিশিষ্ট দেখ

১০। পরিশিষ্ট দেখ।

১১। পরিশিষ্ট দেখ

১২। পরিশিষ্ট দেখ।

আমাদের হৃদয় আনন্দে, সমুদ্র মধ্যস্থ স্বর্ণ-তরণীর ন্যায় নৃত্য করিতেছে।

ভ্রাতৃগণ! আজিকার শুভমুহূর্ত্ত আর একটী কারণে বিশেষ আনন্দের দিন। মিনায়—যে স্থানে খোদাতালার বন্ধু হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লা—তাঁহার একমাত্র প্রিয়পুত্র হজরত এসমাইল জবেহুল্লাকে খোদাতালার আদেশে কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহারই আদেশে হজরত এসমাইলের পরিবর্ত্তে, স্বর্গীয় দোম্বা কোরবানী করেন, আজ এই শুভমুহূর্ত্তেই ধর্ম্মপ্রাণ হাজীগণ সেই পবিত্র স্থানে কোরবানী করিয়া কি পবিত্র আনন্দই উপভোগ করিতেছেন, তকবির রবে সেই পুণ্যভূমি প্রতিধ্বনিত করিতে-ছেন, দয়াময়ের পবিত্র গৃহ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। জমজম কূপের শীতল জল পান করিয়া প্রাণের গূঢ়তম প্রদেশের তৃষ্ণা ক্লান্তি নিবারণ করিতেছেন।

যে পবিত্র স্থানে হজরত আদম (আ) হজ-

রত হাওয়ার (আ) সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, যে পবিত্রদেশে হজরত হাজেরা (আ) হজরত এসমাইল (আ) সহ নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, যে পবিত্রস্থানে হজরত এব্রাহিম (আ) পবিত্র কাবাগৃহ (১৩) প্রস্তুত করিয়া ঐ গৃহে উপাসনা করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন; আজ তাঁহারা সেই সকল পবিত্র ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

আজ তাঁহারা হজরত মহাম্মদ মস্তাফা আহমদ মোজতাবার (দ) যশস্বী জন্মভূমিতে বিচরণ করিতেছেন। হজরত আবুল কাসেমের (দং) জন্মস্থান, লীলা ক্ষেত্র, উপাসনাস্থান—প্রভৃতি দর্শন করিয়া আত্মা সার্থক করিতেছেন। প্রভু কোন্ স্থানে বসিতেন, কোথায় পদচারণা করিতেন, কোথায় নির্জ্জনে খোদাতালার চিন্তা করিতেন, কোথায় প্রাণের পবিত্র ধর্ম্মোচ্ছ্বাস উৎস্রাবিত করিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তির স্রোত বহাইতেন, কোথায় বিধর্ম্মীদিগের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত পবিত্র লীলাক্ষেত্র

যাঁহারা এই চর্ম্ম চক্ষে দেখিয়া জন্ম ও নয়ন সার্থক করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য! সে পবিত্র কথা স্মরণ করিতেও প্রাণের ভিতর কি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রতিভার কি এক উজ্জ্বল তড়িতস্রোত বহিতে থাকে, প্রাণের স্তরে স্তরে কিং এক অদৃশ্য উজ্জ্বল আলোকের দীপ্তি আসিয়া দেখা দেয়, তাহা আজ আমরা এখানে বসিয়াই অনুভব করিতেছি।

কল্পনে! তোমার সহায়তায় এই অপার্থিব সুখ আর ভোগ করিতে চাহি না। হৃদয় প্রকৃতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণের মধ্যে সেই পবিত্র ক্ষেত্র—লীলাস্থল দর্শনের আশা আগ্নেয় গিরি-গর্ভস্থ জ্বলন্ত ধাতুপ্রবাহের ন্যায় জ্বলিতেছে। এমন শুভ দিন কবে হইবে যে, দয়াময় প্রভুর পদচিহ্ন সম্বলিত লীলাক্ষেত্র দেখিবার শুভদিন উপস্থিত হইবে?

উপক্রমণিকায় আমরা যত দূর বলিলাম, তাহা কেবল প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাসের বেগে। এ পবিত্র

উৎসব দিনে যে আনন্দ হৃদয়ের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা তাহারই সামান্য উচ্ছ্বাস মাত্র।
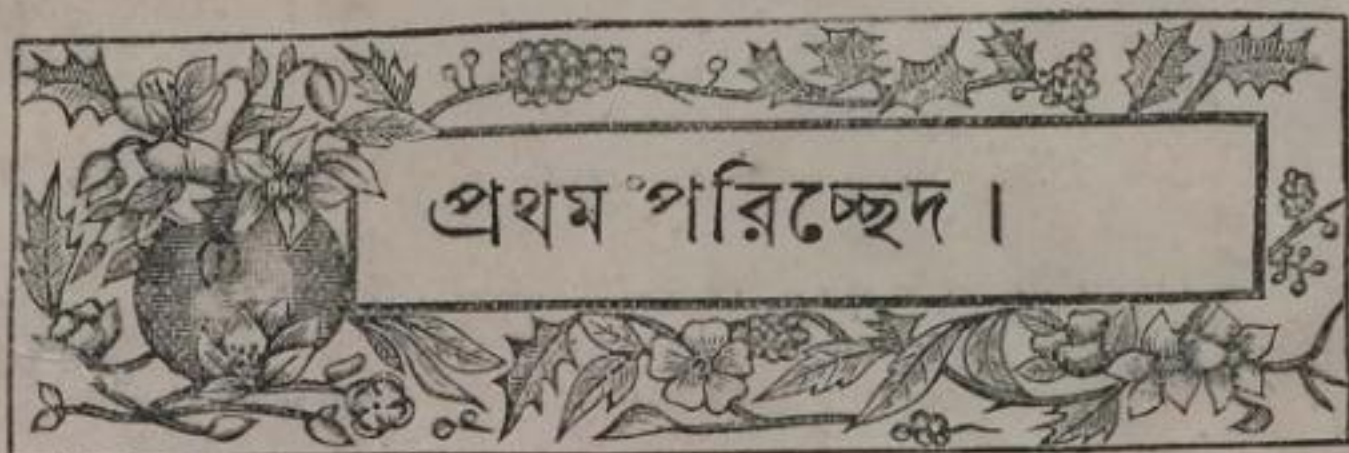
প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন—প্রত্যাদেশ।

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

رؤيا الانبياء فى المنام وحى *

গভীরা রজনী। সমস্ত প্রকৃতি সুপ্ত। রাত্রির নির্জ্জনতা চারিদিক গ্রাস করিয়াছে। জগতের সমস্ত জীব জন্তুই ক্ষণকালের জন্য যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই গভীর রাত্রিতে হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লা (আ) গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

সাধু পুরুষের নিদ্রা—কাজেই হজরত এব্রাহিম

(আ) বাহ্য দর্শনে সম্পূর্ণরূপে জগতের চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু তাঁহার মন সেই অবস্থাতেই তাঁহার করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তায় নিমগ্ন।

হজরত এব্রাহিম (আ) গভীর নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তাঁহার প্রতি আদেশ হইতেছে "হে এব্রাহিম! আমা ভিন্ন তোমার যে প্রিয়—যাহাকে তুমি প্রাণের অধিক মনে কর, যাহার সুখে তোমার হৃদয় প্রফুল্লিত ও আহ্লাদিত হয়, যাহার সুন্দর প্রশান্ত বদন দেখিলে তোমার হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, যাহার মধুর স্নেহবাণী শুনিলে তোমার প্রাণে প্রীতির উৎস বহে, তোমার সেই এক মাত্র প্রিয়তম পুত্রকে আমার নিকট উৎসর্গরূপে কোরবানী কর।" ❋

---

* কোরাণের টীকাকারগণ

* قال يا بني اني ارى فى المنام اني اذبحك *

অর্থে কেহ বলেন, "হজরত এব্রাহিম (আ) তাঁহার এক মাত্র প্রিয়তম পুত্র হজরত এসমাইলকে (আ) খোদায়াতালার পবিত্র নামে কোরবানী করিবার আদেশ স্বপ্নে পাইয়াছিলেন"।

রাত্রি কাটিয়া গেল, কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তামসী রজনী অপসৃতা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বাকাশ লোহিত কিরণচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য উদিত হইলেন। আবার জগৎ হাসিল, আবার বিহঙ্গকুজন, কানন হইতে কাননান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল, আবার লতা বল্লরী

আবার কেহ বলেন, "হজরত এব্রাহিম (আ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমপুত্র হজরত এসমাইলকে (আ) খোদাতায়ালার পবিত্র নামে কোরবানী করিতেছেন"। যাঁহারা বলেন, তিনি ঐরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কোরাণ শরিফেই আছে হজরত এব্রাহিম (আ) যখন হজরত এসমাইল (আ)কে বলিয়াছিলেন যে, "আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি এখন ভাবিয়া দেখ তুমি কি বিবেচনা কর"। তাহার উত্তরে হজরত এসমাইল (আ) বলিয়াছিলেন

قال يا ابت افعل ما تو مر *

"হে পিতঃ! যেরূপ আপনি আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাই করুন।" যাঁহারা বলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকে কোরবানী করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যখন হজরত এব্রাহিম (আ), হজরত এসমাইলকে (আ) কোরবানী করার জন্য তাঁহার ললাটদেশ

হইতে প্রভাত সমীর সঞ্চারে শিশির ঝরিতে লাগিল। আবার প্রভান্ত সমীর ফুলের সুবাস লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু হজরত এব্রাহিমের (আ) মন সম্পূর্ণ চিন্তাকুলিত; রাত্রির স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনে জাগ্রতভাবে পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় রজনীতে আবার হজরত এব্রাহিম (আ) নিদ্রিত। আবার সেই অদ্ভুতস্বপ্ন ও প্রত্যাদেশ। তৃতীয় রাত্রিতেও পুনরায় সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যুষে হজরত এব্রাহিম (আ) শয্যা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মনে তিন রাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নের কথা জাগিতেছে।

মাটীতে স্থাপন করিয়া কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন।
فلما اسلما و تله للجبين و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا

"আমি এব্রাহিমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে"। হাদিস শরিফে আছে, নবিগণ স্বপ্নে যাহা দেখেন, তাহা অহি। সুতরাং উভয়েরই অর্থ এক, কেবল শব্দের পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

নবিগণের স্বপ্ন অলীক নহে, তুমি আমি অনেক সময় অনেক প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। স্বপ্নকে অমূলক কল্পনা বা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা-জনিত অলীক চিন্তা মনে করি, কিন্তু নবিগণের স্বপ্ন তাহা নহে। তাঁহারা যাহা দেখেন, সমস্তই সত্য। তাঁহাদের কোন কার্য্য, কোন অবস্থা বা কোন বিষয়ে মিথ্যার লেশমাত্র নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য। তাঁহাদের জাগ্রত অবস্থা যেরূপ, নিদ্রিত অবস্থাও সেইরূপ। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা যেরূপ খোদা-তালার আদেশ হজরত জিবরিল (আ) প্রমুখাৎ পাইয়া থাকেন বা কখনও সেই আদেশ তাঁহাদের মনে উদয় হয়, তাহাকেই "অহি" বলে, নিদ্রিতা-বস্থায় তাঁহাদের স্বপ্ন সেইরূপ "অহি" বলিয়া গণ্য। কারণ নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহাদের মন দয়াময়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সুতরাং তাঁহাদের স্বপ্ন কোন রূপ ভ্রমাত্মক হইতে পারে না।

জেলহজ্জ মাসের অষ্টম রজনীতে তিনি

প্রথম স্বপ্ন দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করেন, নবম রাত্রিতেও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ঐ কার্য্য করাই স্থির করেন। দশম রজনীতে পুনরায় স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া প্রাতেই তাহা প্রতিপালনে অগ্রসর হন।

হজরত এব্রাহিম (আ) প্রভুর আদেশ পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অশেষ বল। তাঁহার প্রাণে অতি উন্নত বাসনা। পার্থিব মায়া, স্নেহ-বন্ধন তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রভুর আদেশ পালনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাহা করিতেই হইবে। কাজটী অতি নিষ্ঠুর। প্রবীণ বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বলস্বরূপ নিজ ঔরসজাত আত্মজের জীবনদীপ নিজ হাতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া পিতার পক্ষে অসম্ভব। অহো অতি কষ্টের কথা! পার্থিব স্নেহ মমতার অধিকার স্থলে—হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে আর এক উচ্চতম লক্ষ্য তাঁহার হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করি-

য়াছে। তাহা আর কিছুই নয়, সেই অদ্ভুত স্বপ্ন ও প্রভুর প্রত্যাদেশ। (*)

---

* হজরত এব্রাহিম (আ) দয়াময় স্জনকর্ত্তার সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রভো! আমাকে এক কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুশীল নিষ্ঠাচারী ধার্ম্মিক পুত্র দান কর"। তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া দয়াময় তাঁহাকে এক সহিষ্ণু পুত্র দান করার সুসংবাদ দেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরাণ শরিফে আছে।

فبشرناه بغلام حليم

"আমি তাহাকে এক সহিষ্ণু পুত্র দান করার সুসংবাদ দিই"। তৎপর তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার পত্নী হজরত হাজেরার গর্ভে তাঁহার প্রথম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এসমাইল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় তিনি কোরবানীর প্রত্যাদেশসূচক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন সে সময় হজরত এসমাইলই (আ) তাঁহার এক মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক জীবন সর্ব্বস্ব পুত্র ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
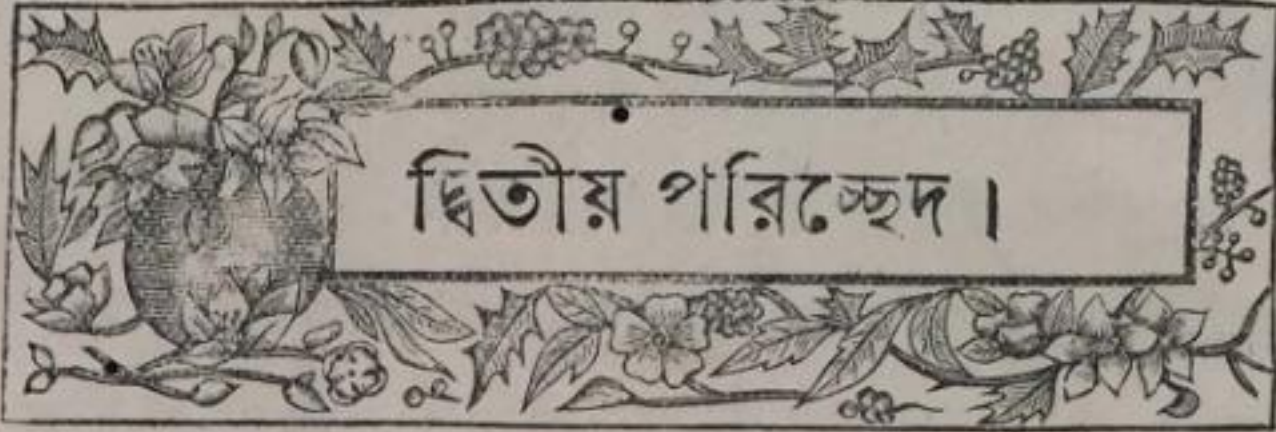
পিতার প্রতি—শয়তানের উক্তি।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ *

জরত এব্রাহিম (আ) প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া প্রত্যহ যেরূপ পুত্র সহকারে কাষ্ঠ আহরণে বহির্গত হইতেন, সেইরূপ কাষ্ঠ আহরণে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমন কালে হজরত এসমাইলকে (আ) আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস! ছুরি ও রজ্জু লইয়া আমার সহিত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে চল।" কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, পিতৃ আদেশ পালনার্থে ছুরি ও রজ্জু লইয়া গমন করিতে

প্রস্তুত হইলে, পিতা অগ্রগামী হইলেন, পুত্রও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

শয়তান কেবল মানবের শত্রু নহে—সে নবিগণেরও পরম শত্রু। যাঁহাদের নিকট সে ক্ষমতায় কীটাণুকীট, পর্ব্বতের নিকট সামান্য ধুলি কণার ন্যায় পরিদৃশ্যমান, সেই শয়তান এমন উপযুক্ত অবসর ছাড়িবে কেন? সে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে—এই বিষম ভক্তি পরীক্ষা ক্ষেত্রে নিজ কলুষিত প্রকৃতির বিষোদ্গীরণে প্রবৃত্ত হইল। আগ্নেয় গিরি গর্ভস্থ রুদ্ধ-প্রবাহ তরল ধাতু-স্রোতের ন্যায় শয়তানের কলুষিত প্রবৃত্তিগুলি এই সময় তীব্রতেজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে দ্রুত পাদবিক্ষেপে প্রথমে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়! আপনি স্বপ্নের কথায় নির্ভর করিয়া নিজ এক মাত্র প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিতে যাইতেছেন ইহা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? স্বপ্ন চিন্তা-প্রসূত অলীক দৃশ্য বইত

নয়। ঐরূপ অমূলক দৃশ্যে নির্ভর করিয়া কেন এরূপ সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন? ইহাতে আপনি চিরকাল বিষম কষ্ট ও অনুতাপ ভোগ করিবেন। লোকেই বা আপনাকে কি বলিবে? ইহা আপনার বাতুলতা বই আর কিছুই নয়। আপনি মনে করিতেছেন—ইহা আপনার প্রভু দয়াময়ের আদেশ। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সৃজনকর্ত্তা সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ মমতা কেন দিয়াছেন? উহা কি তাহার লালন পালন, শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নহে? পিতা মাতার সন্তান সন্ততির প্রতি ঐরূপ স্নেহ না থাকিলে কি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা শিশুদের লালন পালন করিতে পারিতেন? এই জন্যই করুণাময় অপত্য স্নেহ দিয়াছেন। সেই স্নেহের জন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রসূতি প্রসব যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া ঐরূপ ভীষণ যন্ত্রণার সময়েও আত্ম ক্লেশ ভুলিয়া সন্তানের কষ্ট নিবারণ করিতে যত্নবান হন। সন্তানের কোন বিপদ হইলে

স্নেহময় পিতা নিজ অমূল্য প্রাণ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা পিতা মাতার স্নেহের ধর্ম্ম। আপনি সেই পিতৃধর্ম্মে পদাঘাত করিয়া, অপত্য স্নেহে কুঠারাঘাত করিয়া নিজ হস্তে এক মাত্র বংশধরের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার সন্তান ছিল না, বৃদ্ধ বয়সে কত প্রকার আরাধনায়, দয়াময় সমীপে কতরূপ প্রার্থনা ও মিনতি করিয়া সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, কত যত্ন, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই অমূল্যনিধি আপনার জীবনসর্ব্বস্ব বংশধরকে ভবিষ্যৎ আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন্ প্রাণে অকাতরে হারাইতে বসিয়াছেন? আপনি বলেন "প্রভুর আদেশ"। ইহাও কি সম্ভব যে, দয়াময় আপনার আরাধনা ও প্রার্থনায় আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ গুণবান পুত্ররত্ন আপনাকে দান করিয়াছেন, তিনি কোন্ অপরাধে তাহাকে কাড়িয়া লইবেন? বিশেষতঃ

আপনি তাঁহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি এই নির্দ্দোষ বালকের প্রাণনাশ কেন করিবেন? তিনি ত পক্ষপাতী নন, একের অপরাধে অন্যের দণ্ড কেন করিবেন? নিরপরাধ বালক পাপ কাহাকে বলে জানে না—এখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই, পৃথিবীর কোন দুষ্ক্রিয়ারই আস্বাদ গ্রহণ করে নাই, দয়াময় প্রভু কেন অকালে তাহার ক্ষুদ্র জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ করার আদেশ করিবেন? ইহা অতীব অসম্ভব। আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি এই নৃশংস অভিনয়ের যবনিকা পাত করিয়া গৃহে ফিরিলে এই অভাগা বালকের গর্ভধারিণী যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে— “আমার প্রাণের কুমার কোথায়? প্রত্যহই ত সে কাষ্ঠাহরণ করিয়া আপনার সঙ্গেই ফিরিয়া আইসে, অদ্য তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন? আমার যে প্রাণের মধ্যে কিরূপ হুহু করিতেছে, তাহার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

সে আপনার সঙ্গে নাই কেন? তাহার অদর্শনে আমি সমস্তই অন্ধকার দেখিতেছি, সে যে আমার অন্ধের যষ্টি—দেহের জীবনীশক্তি, তাহাকে না দেখিয়া, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছে। আপনাকে একা দেখিয়া আমার মন নানা প্রকার অমঙ্গল চিন্তায় আকুলিত হইতেছে। শীঘ্র তাহার কুশল জ্ঞাপন করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন, বিলম্ব হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।” তখন আপনি কি উত্তর করিবেন? আপনি কিরূপে সে অভাগিনী পুত্রগত-প্রাণা জননীকে প্রবোধ দিবেন? কিরূপে বলিবেন—তোমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন সাধের তরণীকে স্বহস্তে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছি। হতভাগিনী যখন শুনিবে—তাহার অন্ধের যষ্টি, আশার ভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, তাহার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা চিরকালের তরে অস্তমিত হইয়াছে; তখন মণিহারা ফণিনীর ন্যায় সে অসহ্য মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় শোকাবেগ ভরে “হা এসমাইল” বলিয়া

প্রাণত্যাগ করিবে। পুত্র হত্যার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হত্যাও হইবে। কোন্ অপরাধে সেই পতি-পুত্র-গতপ্রাণা সতী সাধ্বী স্ত্রীর প্রাণনাশ করিতেছেন? এই কি সেই অবলার পাতিব্রত্যের পুরস্কার? পিতৃধর্ম্ম ও অপত্যস্নেহ পায়ে ঠেলিয়াছেন, দাম্পত্য প্রেমেও কি জলাঞ্জলি দিতে চান? একবার ভাবুন—পুত্রের প্রতি কি অভাগিনী জননীর কোনই অধিকার নাই? সে যে দশমাস তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কত প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, প্রসবকালে মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় ভয়ানক প্রসব বেদনা ভোগ করিয়াছে। হৃদয়ের শোণিত পান করাইয়া বালককে প্রতিপালন করিয়াছে। গৃহ হইতে জন্মের মত যখন অভাগা সন্তানকে লইয়া আসিলেন, তখন তাহার অভাগিনী জননীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? এক মাত্র জীবন সর্ব্বস্ব প্রিয়তম পুত্র চিরদিনের তরে বিদায় হইয়া যাইতেছে, তাহাকে একবার কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া

বিদায় করারও কি অধিকার তাহার নাই? আপনি কি নিষ্ঠুর! কি কঠিন উপকরণে আপনার হৃদয় গঠিত! অহো, কিরূপে সেই নিরপরাধ বালকের কণ্ঠদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিবেন। এই সুশীল বালকের স্নেহ পূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিলে কাহার না দয়া হয়? অভাগা ইহার কিছুই জানে না। সরলতার পূর্ণ প্রতিকৃতি এই বালক মনে করিতেছে "স্নেহময় পিতার সহিত কাষ্ঠাহরণে আসিয়াছি, এখনই গৃহে ফিরিয়া জননীর কোলে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া শান্তি লাভ করিব।" অভাগা স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহার পাষাণ-হৃদয় পিতাই অদ্য তাহার যম, সেই অদ্য অন্যায়পূর্ব্বক নিষ্ঠুরভাবে তাহার গলায় ছুরি দিয়া বধ করিবে। এব্রাহিম (আ), ইহা কখনই দয়াময়ের আদেশ নয়, আপনার ভ্রম হইয়াছে। আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনার ভ্রম দেখাইয়া এই অন্যায় লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আপনি

আমার কথা শুনুন. গৃহে ফিরিয়া যান, এখনও সময় আছে, আমার কথা না শুনিলে আপনি সব হারাইয়া চিরজীবন কষ্ট ও অনুতাপ ভোগ করিবেন। তখন উপায়হীন হইয়া অনুতাপ করিলে কোন ফল হইবে না। মাথা কুটিয়া চিরজীবন বিলাপ করিলেও হারাধন ফিরিয়া পাইবেন না, আমি পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, আপনার সোণার সংসারকে অবহেলা করিয়া পদাঘাতে চূর্ণ কবিবেন না। ইহা কখনই আপনার প্রভুর অভিপ্রায় বা আদেশ নয়। ইহা আপনার অমূলক স্বপ্ন ও ভ্রান্তি, আপনার প্রভু বড়ই দয়ালু, তিনি তাঁহার শত্রু বিধর্ম্মীরও আহার যোগান ও তাঁহার পৃথিবী রাজ্যে বাস করিতে দেন। আপনাকে তিনি বন্ধু সম্বোধন করিয়াছেন, আপনার পুত্রও নিষ্পাপ ও তাঁহার প্রিয়পাত্র, তাহাকে কখনই তাহার ভোগ বাসনায় বঞ্চিত করিয়া অকালে তাঁহার বিশাল পৃথ্বীরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে তিনি ইচ্ছা করিবেন

না। ঐরূপ লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর আদেশ করিবেন না। আমি আপনাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলাম এবং এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলাম, এখন আপনার যাহা অভিরুচি করুন!

হজরত এব্রাহিম (আ) রোষকষায়িত লোচনে পাপিষ্ঠের প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতি কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন—"রে পাপমতি! আমি তোকে বিলক্ষণ চিনি। রে দুর্ম্মতি! আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিস্, আত্মীয়তা দেখাইয়া ও পরদুঃখে কপট কাতরতা প্রকাশ করিয়া আমার কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা দিতে আসিয়াছিস্। আমি কিছুতেই প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিব না। সমস্ত পৃথিবী একমত হইয়া যদি আমাকে নিষেধ করে, আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না। প্রভুর আদেশ সচ্ছন্দচিত্তে ভক্তিভাবে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অবনত মস্তকে পালন করিব, তুই তাহাতে কদাচ বাধা দিতে পারিবি না—

দূর হ পামর!" এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি সজোরে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন।
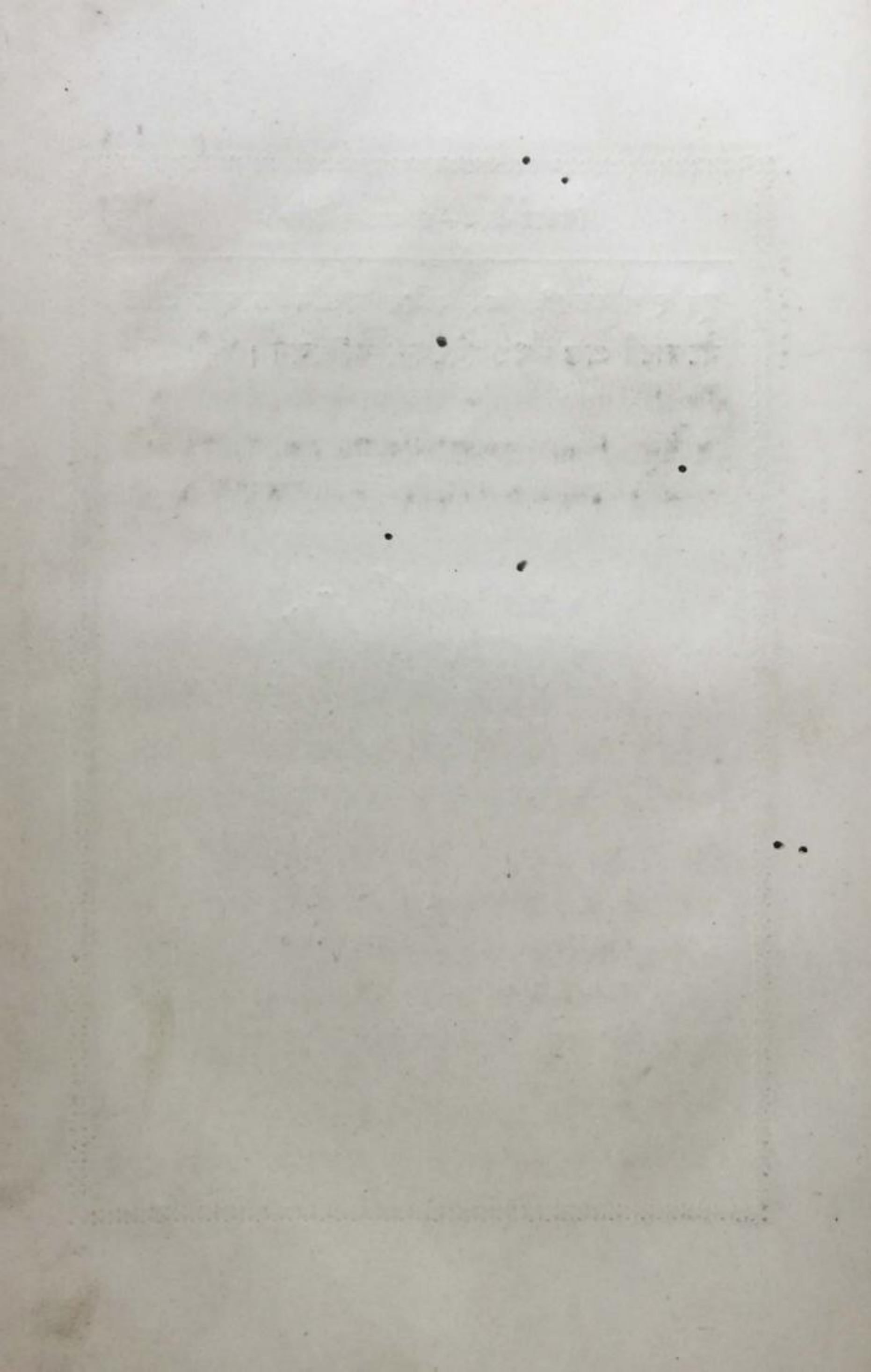
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রের প্রতি—শয়তানের উক্তি।

مرا عهديست با جانان كه تا جان دربدن دارم *

هواداري كويش را چو جان خويشتن دارم *

* حافظ شيرازي

"ওহে মৃত্যু ? তুমি মোরে কি দেখাও ভয় !
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকি মন
অনিত্য সংসার প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ ;
যারা এই ভবরূপ অতিথিভবনে
চির বাসস্থান বলি ভাবে মনে মনে ;
পাপ রূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন,
করি আত্ম অধিকার আছে অনুক্ষণ ;

পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয় ;
প্রেমময় প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয় ;—
হেরিলে নয়নে এই ভ্রুকুটী তোমার,
তাহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার !
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রুভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়,
সফল হইবে আশা যাইব তথায়।”

দুরাচার শয়তান ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিরুৎসাহে ও ভগ্ন-হৃদয়ে আর এক নূতন পথের অনুসরণ করিল। সে মনে মনে ভাবিল, হজরত এসমাইল (আ) অতি শিশু, তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার মনের

গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে অনেক কাজ হইতে পারে। হয়তঃ ইহাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। দুরাশাময়, কার্য্য সাফল্যের এই উৎকট চিন্তায়, অসৎবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত শয়তান, হজরত এসমাইল (আ) জবেহুল্লার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিল, “হে এসমাইল (আ)! কোথায় যাইতেছ?”

সেই সদাপ্রফুল্ল সহাস্যমুখ এসমাইল (আ) উত্তর করিলেন “আমি পিতার সহিত কাষ্ঠারোহণে যাইতেছি।”

দুরাচার, পাপবুদ্ধি, শয়তান তখন সহানুভূতির স্বরে বলিল—“বৎস! তুমি জান না, তোমার কাষ্ঠারোহণ নয়, প্রাণনাশ করিবার জন্য তোমায় লইয়া যাইতেছে।”

এসমাইল (আ) বলিলেন—“অতি আশ্চর্য্য লোক তুমি! পিতা আমায় বধ করিবেন? একথা অসম্ভবের অপেক্ষাও অসম্ভব। কোন্ পিতা নিষ্ঠুর হইয়া নিজ রক্তজাত, জীবনস্বরূপ, আশা-

স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, একমাত্র পুত্রকে ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করেন? আমায় বধ করিবার ইচ্ছা কখনই তাঁহার মনে উদিত হইতে পারে না। আমি তাঁহার নয়নের পুতলী, অন্ধের যষ্টি, বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বল, বিশেষতঃ আমি শিশু, নির্দ্দোষী, পাপের কোন পঙ্কিলতা আমার হৃদয়ে নাই, পিতার নিকট কোন দোষ করি নাই, কেন আমার দয়াময় পিতা আমায় অকারণে বধ করিবেন? যদি বধই করিবেন, তবে এতদিন ধরিয়া এত যত্নে লালন পালন করিলেন কেন? নিজ হস্তে জল-সিঞ্চন করিয়া লোকে যে তরুর প্রাণ প্রদান করে, সে কি কখন তাহার যত্নপোষিত সেই সাধের বিটপীর জীবন নষ্ট করিতে সক্ষম হয়?”

পাপিষ্ঠ শয়তান বলিল—“তোমার পিতা স্বেচ্ছায় তোমার বিনাশ করিতেছেন না। বুঝিতে পারিতেছ না—বালক তুমি, সরল হৃদয় তুমি! তোমার পিতা খোদাতালার আদেশে তোমায়

জবেহ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন এখন সমস্ত কথা বুঝিলে ত ?”

হজরত জবেহুল্লা, খোদাতালার আদেশের কথা শুনিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র, নিষ্পাপ, নিকলঙ্ক, বালকের হৃদয়ে, উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। সেই মহান্ প্রেমময়ের প্রতি প্রেম জাগিয়া উঠিল। হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব তেজে পরিপূর্ণ হইল। প্রাণের ভিতর দিয়া যেন আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইল। তিনি সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন—“দেখ! তুমি যাহাকে নিরানন্দের কারণ বলিয়া দেখাইয়া দিতেছ, আমার ত তাহাতে সমূহ আনন্দ। এ হতভাগ্যের জীবনে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? দয়াময় খোদাতালার আদেশে জীবন উৎসর্গ করিব—ইহা কেবল আমার পিতার নয়, আমারও মহাসৌভাগ্যের বিষয়। খোদাতালা যদি আমাকে সহস্রবার জীবন পরিত্যাগ করিতে বলেন, সহস্রবার প্রাণ-

দান দিয়া অকিঞ্চিৎকর এই জীবন, তাঁহারই কার্য্যে উৎসর্গ করিতে বলেন, তাহা হইলে আমি সহস্রবার অকাতরে, অম্লানমুখে আনন্দের সহিত তাঁহারই পবিত্র নামে জীবন উৎসর্গ করিব। আমি এজন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত এবং আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি।”

ধন্য হজরত এসমাইল (আ)! জবেহুল্লার উপাধি গৌরব আপনিই সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

এবার এসমাইলের (আ) হৃদয় অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। তিনি সেই দুরাত্মার শিষ্টকথার মর্ম্মবোধ করিলেন—শয়তান যে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া অধর্ম্মে মতি দিতেছে ইহা তাঁহার পক্ষে অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল। তিনি দৃঢ়তার সহিত শয়তানকে বলিলেন—“অরে পাপমতি! পিতা সৌভাগ্যক্রমে খোদাতালার আদেশ পালনার্থে আমায় লইয়া যাইতেছেন। তুই বাধা দিতে আসিয়াছিস্!

রে পিশাচ! এখান হইতে তুই দূর হ। এখানে তোর কোন কাজ নাই। যা এখান হইতে এখনি চলিয়া যা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
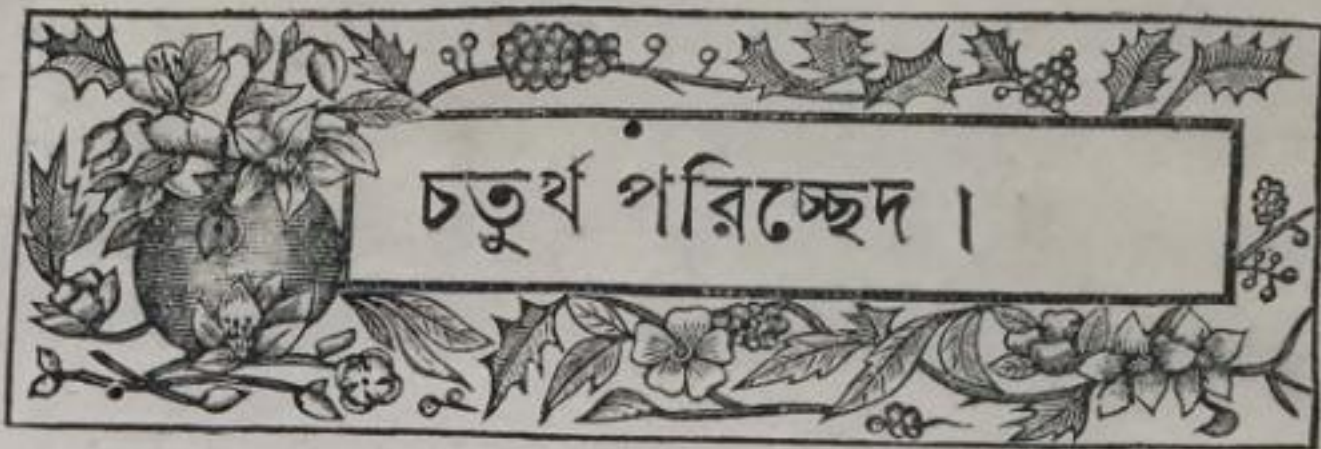
জননীর প্রতি—শয়তানের উক্তি।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ *

পাপমতি শয়তান হজরত এসমাইলের (আ) নিকট মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে না পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শেষ অন্য এক পন্থার অনুসরণ করিল। পাপাত্মা মনে করিল, হজরত হাজেরা (আ) সরলহৃদয়া পুত্রগত-প্রাণা—তাঁহাকে এই সংবাদ দিলে তিনি কোন প্রকারেই ইহা সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার সকল আশা ভরসার কেন্দ্র, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, নয়ন-

পুত্তলি, মাথারমণি, প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণনাশের সংবাদ পাইলে পুত্রগতপ্রাণা জননী উন্মাদিনী হইবেন। তখন তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিবে না। তিনি নিজে হজরত এব্রাহিমের (আ:) নিকট উপনীত হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে এ সংকল্প ও সদনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিবেন। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া শয়তান দ্রুতপদে হজরত হাজেরার নিকট উপস্থিত হইল। আত্মীয়তা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! আপনার প্রাণের কুমার এসমাইল কোথায়?"

সরল-হৃদয়া হাজেরা বলিলেন, "কুমার তাহার পিতার সহিত কাষ্ঠাহরণে গিয়াছে।"

সে হাজেরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভদ্রে! যা বলিতেছ, তাহা নহে। তোমার যে সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে তাহা ত বুঝ নাই। হাঃ হতভাগিনি! নির্দ্দোষ প্রাণের কুমারকে যে জবেহ করিবার জন্য তাহার পিতা লইয়া গিয়াছেন—তাহা কি শুন নাই!"

সরল-হৃদয়া-ললনা আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বল কি? না—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে চাই না। কোন্ পিতা এত নিষ্ঠুর যে তাহার প্রাণাধিক পুত্রকে বলি দিতে পারে?"

তখন শয়তান নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল, "দেখ, বিশ্বাস কর, আর না কর, খোদাতায়ালার আদেশে তোমার পুত্রের প্রাণ আজিই বিনষ্ট হইবে।"

তখন সেই স্নেহময়ী মাতা কি যেন অপূর্ব্বতেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। স্থির, ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে শয়তানকে বলিলেন, "দেখ! খোদাতায়ালা যদি এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পালন করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। তিনিই আমায় পুত্ররত্ন দিয়াছেন, তাঁহারই কৃপায় আমি প্রাণাধিক এসমাইলকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাহার 'মা' হইয়াছি। তিনি দিয়াছেন—তাঁহারই ধন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ফিরাইয়া লইতেছেন, তাহাতে আর আমার ক্ষোভের কারণ কি?

"শুন শয়তান! সত্য বটে, আমি বক্ষস্থলের

শোণিতধারা দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, আহার নিদ্রা সুখ-সচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া তাহার লালন পালন করিয়াছি, তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া প্রাণের ভিতর অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করিতেছি। সে যথার্থই আমার জীবনের ধন, নয়নের মণি, প্রাণের আধার, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়ের জীবনীশক্তি; কিন্তু দেখ, আর একজন তাহা হইতেও আমার প্রিয়তম! সে কে, তুমি জান, তিনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদা-তায়ালা।

"সত্য বটে ইসমাইল আমার সকল আশার জ্বলন্ত কেন্দ্র, তাহার অদর্শনে আমি ক্ষণমাত্রে সমস্তই আঁধার দেখি, তাহার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া শোণিত প্রবাহ ছুটে। তাহাকে না খাওয়াইয়া আমি খাই না, তাহাকে সুকোমল শয্যায় ঘুম না পাড়াইয়া আমি শুই না। তাহাকে বক্ষের মধ্যে না লইলে আমার নিদ্রা হয় না। তাহার বিরহে একদণ্ড আমার পক্ষে

এক এক যুগব্যাপী মৃত্যু, কিন্তু তুমি শয়তান নিশ্চয়ই জানিও, তাঁহার যাহা আদেশ, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইবে। যাও তুমি—দূর হও, আর আমায় প্রলোভিত করিও না।"

এই তেজোগর্ভ ধর্ম্মানুরক্তিপূর্ণ বাক্যে পাপিষ্ঠ শয়তান ব্যর্থমনোরথ হইল, এবং কোন স্থানেই মুখ না পাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া দুঃখ কষ্ট ও লজ্জায় ব্যথিত চিত্তে বিমর্ষভাবে বিষণ্ণ বদনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

পাপাত্মা শয়তান অকৃতকার্য্য হইবে না কেন? এত সামান্য মানব পরিবার নয়। আমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে যেমন গৃহস্বামীর এক মত, গৃহিণীর অন্য মত, আবার পুত্রের স্বতন্ত্র মত—এ নবি পরিবারে সেরূপ হইতে পারে না। এ পরিবারে কর্ত্তার যে ইচ্ছা হইবে, কর্ত্রী তাহা সন্তোষের সহিত অনুমোদন করিবেন; পুত্র তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তা নবি, ভার্য্যা নবিপত্নী ও নবিমাতা,

পুত্রও নবি। এস্থলে মতভেদ হইবে কেন? ইঁহারা ত সামান্য মানব নন। যে উপকরণে সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য গঠিত, ইঁহারা ত সে উপকরণে গঠিত হন নাই। জ্ঞান ও মহত্ত্ব, শীলতা ও সচ্চরিত্রতা, বুদ্ধি ও বিবেক, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, প্রেম ও ধর্ম্মপ্রাণতা, প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যপালন, শিষ্টাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ইঁহাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। ইঁহাদের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না। ইঁহারা খোদাতায়ালার প্রেমে মগ্ন, তাঁহার আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর, তাঁহাকে অদেয় ইঁহাদের কিছু নাই। ইঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং পাপমতি দুরাচার শয়তানের কুহকে সহজে ভুলিবেন কেন? তাহার ছলনায় ইঁহারা প্রতারিত হইবেন কেন? খোদাতায়ালার প্রেমই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার আদেশ পালনই তাঁহাদের কার্য্য। দিবা রাত্রি শয়নে জাগরণে তাঁহারই আদেশের কামনা

করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রভুর আদেশ অবগত হইয়াছেন, এখন তাঁহাদের হৃদয় স্বর্গীয়বলে বলীয়ান, দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যপালনার্থ দ্রুতগতিতে চলিয়াছেন, এ গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? পর্ব্বত-গাত্র-নিঃসৃত বেগবতী নদীর বেগ ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, তাঁহার ইচ্ছার স্রোত—ভিন্নমুখে পরিচালিত করাও তদপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার।
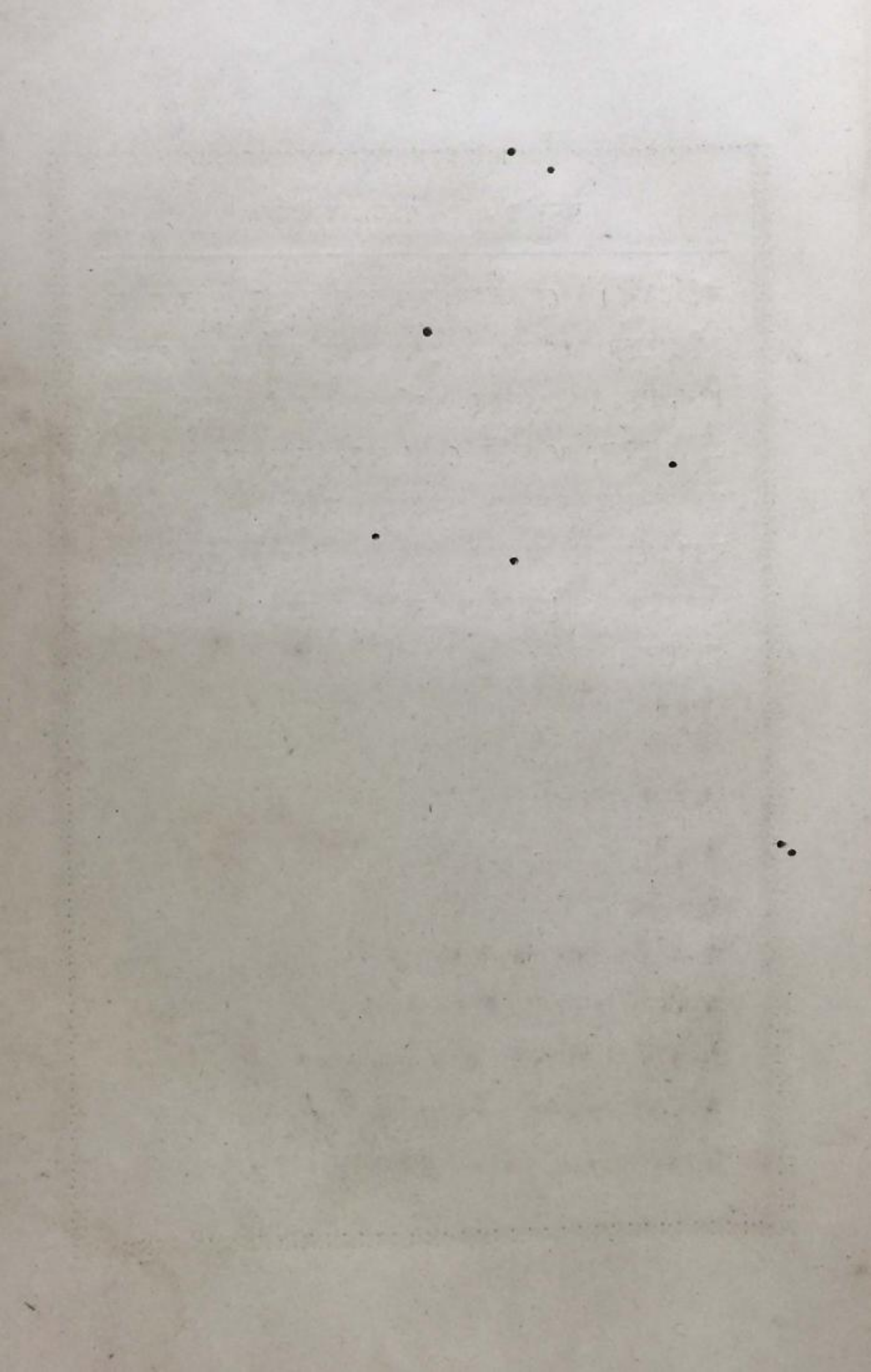
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুত্রের পরীক্ষা।

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ *

خرم ان روز کزین منزل ویران بروم *
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم *
چون صبا بادل بیمار و تن بے طاقت *
بهوا داري ان سرو خرامان بروم *
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت *
رخت بربندم و تا ملک سلیما بروم *

حافظ غیب اللسان *

হজরত এব্রাহিম (আ) কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শাবেসাবির নামক স্থানে পৌঁছিয়া মনে করিলেন, কিছু না বলিয়া পুত্রকে কোরবাণী করিয়া ফেলিলে নিজের কর্ত্তব্যপালন হইবে বটে, কিন্তু পুত্রের

পরীক্ষা হইবে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এই বিষম ভক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সাহস তাহার আছে কি না? সে যদি অবনত মস্তকে এই আদেশপালনে উদ্যত হয় তাহা হইলে বুঝিব সে আমার উপযুক্ত বংশধর; পিতা পুত্রে—উভয়েই কর্ত্তব্যপালন করিয়া অসীম পূণ্য সঞ্চয় করিতে পারিব। সে অসমর্থ হইলে আমার কর্ত্তব্য আমি অবশ্যই পালন করিব। এই মনে করিয়া স্নেহময় পিতা বাষ্পজড়িত গদগদ কণ্ঠে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, খোদাতালা তোমাকে তাঁহার পবিত্র নামে কোরবাণী করিতে আদেশ করিতেছেন, এখন তুমি কি বিবেচনা কর।"

সহিষ্ণু, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র আনন্দ গদগদস্বরে উত্তর করিলেন—"পিতঃ! ইহা কি সত্য, আমি কি এতই ভাগ্যবান যে, খোদাতালার পবিত্র নামে তাঁহারই আদেশে উৎসর্গীকৃত হইব? এই অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর জীবন তাঁহারই কার্য্যে

নিয়োজিত হইবে? ধন্য আমি! ধন্য আমার জীবন! ধন্য আপনি! আর ধন্য আপনার পিতৃত্ব। পিতঃ আর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা কেন? প্রভুর কার্য্যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আমি যদি সহস্র প্রাণ পাই, তাহাও সে খোদাতালার আদেশ, তাঁহারই পবিত্র নামে উৎসর্গ করিতে আহ্লাদের সহিত অগ্রসর হইব। ইহা অপেক্ষা মহাসুখের চরমসীমা কি আছে? আপনি নিতান্ত ভাগ্যবান, তাই খোদাতালার এই আদেশ পাই-য়াছেন। পিতঃ সত্বর হউন, শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিবেন না। আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, এখনি তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলুন। ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত আমি এ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। শুভকার্য্যে পদে পদে বিঘ্ন, পাপ-মতি শয়তান ইহাতে পদে পদে আশঙ্কা ও বিঘ্ন ঘটাইতেছে।

হজরত এব্রাহিম (আ) বলিলেন, "বৎস! পাপকার্য্যে মতি দেওয়াই ত শয়তানের জীবনের

লক্ষ্য—এর আর আশ্চর্য্য কি! দুরাত্মা এই মাত্র আমার নিকটেও আসিয়া আমাকে প্রতারিত করিতে যত্নবান হইয়াছিল। দুষ্ট আমাদের কি করিবে, উহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ কর। পিতা পুত্র উভয়েই কয়েকখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া লইয়া দুরাচার শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

ধন্য হজরত এসমাইল (আ)! সহিষ্ণুতা ইহাকেই বলে। ইহাই কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয়। প্রভুর ইচ্ছায় সম্মতি, অবনত মস্তকে প্রভুর আজ্ঞা বহন, ইহাই আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন। আমরা সামান্য কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় কতদূর ভীত হই, আর আপনি নিজ অমূল্য প্রাণ অকাতরে দান করিতে প্রস্তুত হইয়া নির্ভীকচিত্তে শাণিত ছুরিকার নিম্নে নিজ গ্রীবা স্থাপন করিতে আনন্দের সহিত প্রস্তুত!! আপনিই আত্মোৎসর্গের আদর্শ। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যপালন, প্রভুভক্তি, খোদাতালার প্রতি প্রেম ও তাঁহার আদেশ পালনের শিক্ষক

রূপে আপনিই পরবর্ত্তীগণের অগ্রণী। আপনার এই কীর্ত্তিকাহিনী চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত থাকিবে।

এখন যে স্থানকে মিনা বলে, সেই স্থান হইতে উভয়ে সেই কোরবাণী ক্ষেত্রে শাবেসাবির নামক স্থানে গিয়াছিলেন! *

* যে স্থানে এই কোরবাণী হইয়াছিল তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন শাবে সাবির, কেহ বলেন মিনা, কেহ বলেন—মিনার মসজিদে, কেহ বলেন মোকামে এব্রাহিমে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতার নিকট পুত্রের অন্তিম প্রার্থনা।

قال (الذبيح لابراهيم عليهما السلام) اشدد رباطي لا اضطرب و اكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينتقص اجري و تراه امي فتحزن و اشحذ شفرتك و اسرع امرارها على حلقي حتى تجهز علي ليكون اهون فان الموت شديد و اقرأ على امي السلام و ان رأيت ان ترد قميصي على امي فافعل فانه عسى ان يكون اسهل لها فقال ابراهيم نعم العون انت يا بني على امر الله * كشاف

পিতা পুত্র উভয়েই তখন খোদাতালার আদেশে বলীয়ান ও দৃঢ়চিত্ত। তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয় উদ্যমে পূর্ণ। ক্রমে সেই মহাপরীক্ষার শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হজরত এব্রাহিম (আ)

বলিলেন, "বৎস! এখন প্রস্তুত হও—আর বিলম্ব নাই।" হজরত এসমাইল (আ) দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি। কিন্তু স্নেহময় পিতঃ! অন্তিমকালে আমার কয়েকটী শেষ প্রার্থনা আছে। তাহাই আমার শেষ অনুরোধ। তাহাই আমার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষ আকুল বাসনা, আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের অতি ক্ষুদ্রতর কামনা।"

"পিতঃ! আপনি আমার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করুন। কারণ আমার বড়ই কোমল প্রাণ! মৃত্যুকাল বড় কঠিন সময়! এরূপে বন্ধন করুন যেন, শাণিত ছুরিকার কঠোর আঘাতে ব্যথিত হইয়া কোন দিকে হেলিতে দুলিতে না পারি। কারণ ঐ সময় হেলিলে দুলিলে খোদা তালার আদেশ প্রতিপালনে বাধা বা বিলম্ব ঘটিতে পারে এবং আমার অসহিষ্ণুতায় ঐ পবিত্র কার্য্যের ফলের হ্রাস হইতে পারে।

"আপনার পরিধান বস্ত্র সাবধান হইয়া গুছা-

ইয়া লইবেন। যেন আমার রক্ত তাহা স্পর্শ করিতে না পারে। কারণ আপনার বস্ত্রে আমার রুধির চিহ্ন থাকিলে, তাহা আপনার ও আমার স্নেহময়ী মাতার প্রাণে বড় আঘাত করিবে।”

“ছুরিকা উত্তমরূপে শাণিত করিয়া লউন। যেন জবেহ সহজে হইতে পারে। খোদাতালার আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব না হয়। আপনাকেও বেশী কষ্ট না পাইতে হয়।”

“পিতঃ! একবার গৃহের কথা ভাবিয়া দেখুন! সেই আকুলা হরিণীর ন্যায়, চঞ্চল-হৃদয়া আমার স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করুন। জননী আমার—আমা বই আর যে জানেন না। আমি তাঁহার নয়নের মণি, হৃদয়ের শোণিত, হৃদ্‌কোষ্ঠে শ্বাস, দেহে প্রাণ ও শরীরে শক্তিস্বরূপ। আমি তাঁহার জীবনাকাশে ধ্রুবতারা, স্নেহের পুতলি, আশার বস্তু, প্রাণের প্রাণ—জীবনের জীবন। আমি যে তাঁর একমাত্র হৃদয় রত্ন! তিনি যে একদণ্ড আমায় না দেখিলে ব্যাকুল

হইয়া পড়েন, রাত্রে শয়নকালে তাঁহার কোলের কাছে থাকিলেও, বৃথা স্বপ্নে আকুলিত হইয়া "কোথায় আমার এসমাইল" বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠেন। যেখানকার যে ভাল জিনিষটি নিজে না খাইয়া, আমার জন্য তুলিয়া রাখেন। আমার গায়ে সামান্য তৃণের আঘাত লাগিলেও, তিনি ব্যথিত হইয়া রোদন করেন। সমস্ত সংসারের অগণিত কর্ত্তব্য একদিকে, আর আমায় একদিকে রাখিয়া, যিনি আমায় এতকাল হৃদয়ের শোণিত দিয়া পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, আমার সেই অভাগিনী জননীর কথা ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে।"

"পিতঃ! স্নেহময় পিতঃ! একবার সেই ভয়ানক সময়ের কথা, কল্পনায় স্মরণ করুন দেখি! আপনি অভাগিনীর হৃদয়রত্নকে কাষ্ঠাহরণ ছলে বক্ষচ্যুত করিয়া আনিয়াছেন। যখন মাতা দেখিবেন, আপনি একা ফিরিয়াছেন, আর আমি সঙ্গে নাই, তিনি তখনই উন্মাদিনী হইয়া উঠি-

বেন। তার পর যখন আপনি এই কঠোর হৃদয়-বিদারক মর্ম্মভেদী কথা তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে খুলিয়া বলিবেন, জননী যখন শুনিবেন তাঁহার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, অন্তরের অন্তর, সংসারের ভরসা, একমাত্র ধ্রুবতারা জগৎ হইতে জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন সেই হতভাগিনী যে ভিন্ন বক্ষা শুক্তির মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যাতনায় ছটফট করিবেন। আহা! পিতঃ! উন্মাদিনীর আকুল বিলাপের সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে, অজস্র অশ্রুবারিতে, অগণ্য হা-হুতাশে, এই মেদিনী আকুল হইয়া উঠিবে। পিতঃ! আপনার কাছে আমার এই বিশেষ অনুরোধ, আপনি জননীকে স্নেহগর্ভ মধুরবচনে সান্ত্বনা করিবেন। ধীরে ধীরে সকল কথা বুঝাইয়া, খোদাতালার আদেশবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবেন। আমার বস্ত্রখানি * তাঁহাকে জনমের শেষ উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন।

* কেহ বলেন, ঐ বস্ত্রে তাঁহার কাফন করিতে বলিয়াছিলেন।

"আমার অভাগিনী জননী এ ঘটনার কিছুই অবগত নন। এই হৃদয়বিদারক সাংঘাতিক কার্য্য যে তাঁহার অসাক্ষাতে সম্পাদিত হইতেছে—তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। আহা! আমিও আসিবার সময়ে ইহার কিছুই জানিতাম না। তাহা হইলে জন্মের মত তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসিতে পারিতাম। পিতঃ! সেই স্নেহময়ী আমাগত-প্রাণ মাতৃচরণে আমার ভক্তিপূর্ণ শত সহস্র সালাম জানাইবেন।"

"পিতঃ! কোরবানীর সময় আমার মুখ মৃত্তিকার দিকে স্থাপন করিবেন—যেন আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখিতে না পাই। পিতঃ! আমার এই সরল শান্ত অথচ প্রাণবধ যাতনায় কাতর, মুখভাব দেখিলে, আপনার প্রতিজ্ঞার বাঁধ অতি অনায়াসেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আমি আপনার স্নেহময়, প্রীতি বিভাসিত-মুখমণ্ডল দেখিলে—আবার হয়তঃ জীবনের মায়ায় আবদ্ধ হইতে পারি। আপনার হৃদয়ে উচ্ছ্বলিত সমুদ্র-

প্রবাহবৎ স্নেহরাশি দেখিলে আমার হয়ত হৃদয়ের সাহস কমিয়া যাইতে পারে। স্নেহময় পিতঃ! বাধ্য হইয়া আমাদের উভয়কেই কর্ত্তব্যকে স্নেহের মুখে বলি দিতে হইবে। এরূপ কার্য্য দ্বারা আমরা উভয়েই প্রভুর নিকট অপরাধী হইতে পারি।"

ইহাই হজরত এসমাইলের (আ) পিতার নিকট শেষ প্রার্থনা ছিল। স্নেহময় পিতা সমুদয়ই স্বীকার করিয়া বলিলেন—"প্রিয় বৎস! আজ আমার সুখের সীমা নাই। পরীক্ষায় দেখিলাম, তুমি আমার উপযুক্ত বংশধর। খোদাতালার আদেশ প্রতিপালনে তুমি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিলে।" এই বলিয়া স্নেহময় পিতা স্নেহের সহিত তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন।
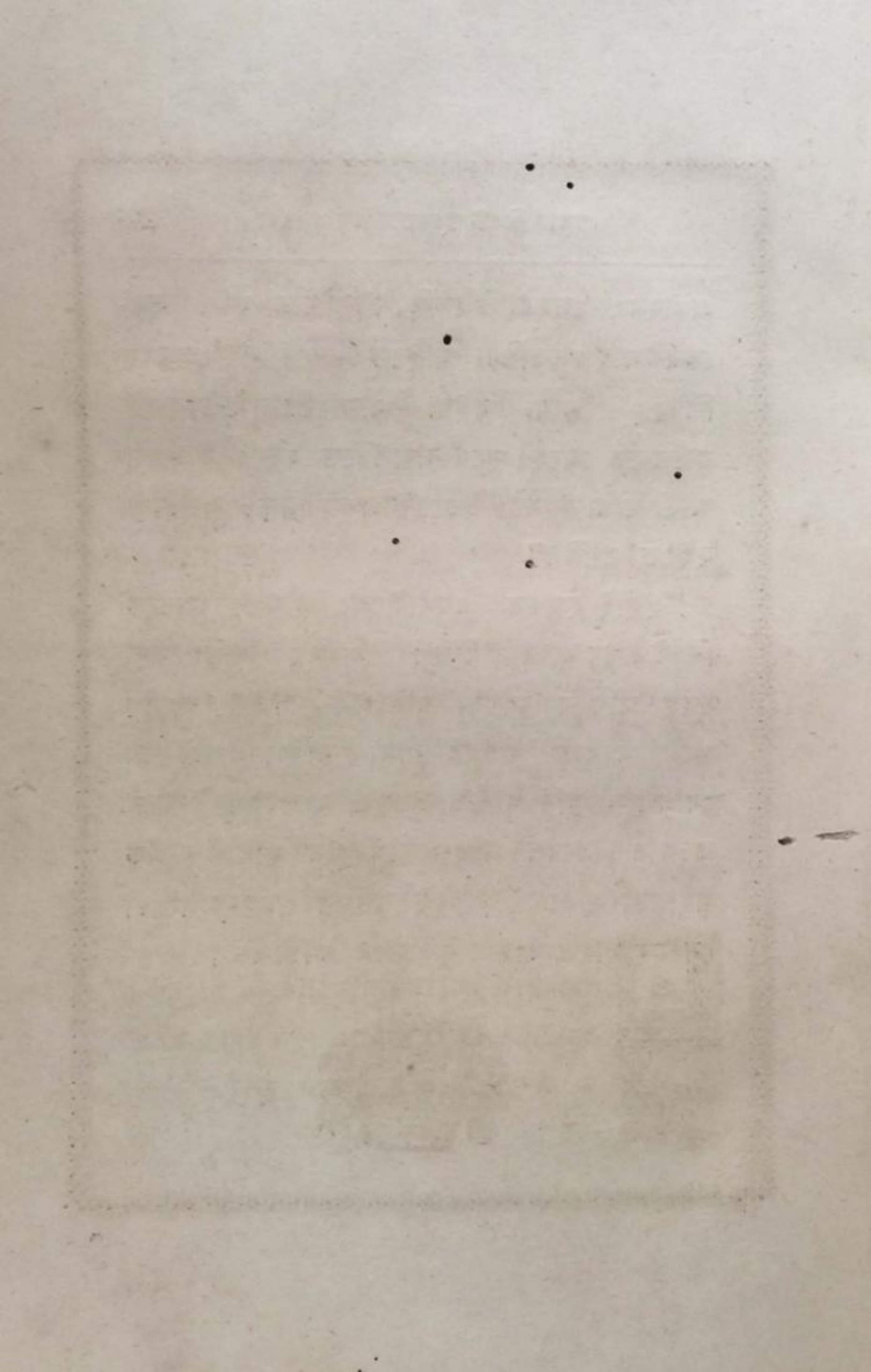
সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাদেশ পালন ও পুরস্কার।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ *
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ج إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
فِي الْاٰخِرِينَ * سَلَامٌ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ * كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * قرآن مجيد *

এবার সেই কঠোর পরীক্ষার সময় আসিল। হজরত এব্রাহিম (আ) এইবার ভক্তি ও হৃদয়ের বল পরীক্ষার জন্য সম্যক-রূপে প্রস্তুত হইলেন। তিনি

রজ্জু লইয়া হজরত এসমাইলের কোমল হস্ত পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। এব্রাহিমের (আ) হৃদয় তখন অপূর্ব্ব তেজে দীপ্তিমান!! মায়া মমতার সমস্ত বাঁধই—কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার তীব্র উচ্ছ্বাসের মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি পুত্রকে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, মাটির দিকে মুখ রাখিয়া শয়ন করাইলেন। হজরত এব্রাহিম (আ) প্রভুআজ্ঞা প্রতিপালন ও হজরত এসমাইল (আ) পার্থিব মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র পরম প্রিয়তমের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উৎসাহের সহিত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

প্রদীপ্ত সূর্য্যকরে, একবার সেই শাণিত অস্ত্র ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্র যেমন শিকারকে হস্তগত করিয়া, তাহাকে বিদীর্ণ করিবার মুখে—একবার ত্রস্তে জিহ্বার বিকাশ করে, শাণিত ছুরিকাও সেইভাব প্রকাশ করিল। তারপর সেই ভীষণ ছুরিকা সবলে এসমাইলের

(আ) কোমল—অতি কোমল অতি সুকুমার, কণ্ঠদেশে আমূল নিমজ্জিত হইল।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই ভীষণ ছুরিকার আঘাতে কোন আঁচড় বা দাগ লাগিল না। একবিন্দুও শোণিতপাত হইল না। হজরত এব্রাহিম (আ) যতই বল প্রকাশ করিলেন, ততই অকৃতকার্য্য হইলেন। * ঐরূপ নৃশংসভাবে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক সরল বালকের কণ্ঠদেশে শাণিত

* কেহ বলেন, ছুরিকার ধার নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল, আবার কেহ বলেন, ছুরিকা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কেহ বলেন, দয়াময় এক খণ্ড তাম্রপাত্র হজরত এসমাইলের (আ) কণ্ঠদেশে স্থাপন করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ হইতে পারে নাই। কেহ বলেন, কাটিয়াছিল বটে কিন্তু কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কেহ বলেন, ছুরি সঞ্চালন করিতে হয় নাই, কণ্ঠে অস্ত্র বিদ্ধ করিতে উদ্যত হওয়া মাত্রই, খোদাতালার আদেশ হয় "তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আমি প্রসন্ন হইলাম ও এসমাইলের পরিবর্ত্তে কোরবাণী করার জন্য স্বর্গীয় দুম্বা প্রেরণ করিলাম।"

অস্ত্রের চালনা দেখিয়া ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত)গণ কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিলেন—"প্রভো! এব্রাহিমকে তুমি বন্ধু সম্বোধন করিয়াছ। এসমাইল তোমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কি অপরাধে তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া ওরূপ কঠিন ব্যবহার করিতেছ? এ ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বৃদ্ধ পিতা ও শিশু পুত্রের প্রতি দয়া কর, উহাঁদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।" দয়াময়ের আদেশ হইল—"আমি আমার প্রিয়বন্ধু এব্রাহিমকে পরীক্ষা করিলাম। সে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না দেখিলাম। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ও তাহার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইয়াছে। আমার আদেশ পালন করিয়াছে, এজন্য আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলাম।"

এব্রাহিম (আ) বড়ই কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন। একে প্রাণাধিক শিশু পুত্র, তাহাতে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। দয়াময় সমীপে কত

আরাধনা প্রার্থনা করিয়া এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন উপযুক্ত রূপবান ও গুণবান ধার্ম্মিক পুত্র—যাঁহার বিনিময়ে নিজ প্রাণ অতি তুচ্ছ, তাঁহাকে এইরূপ নৃশংসভাবে নিজ হস্তে কোরবাণী করা সামান্য কার্য্য নহে! আবার যিনি পরীক্ষক তিনি কাহারও ধন প্রাণ গ্রহণ করেন না। কেবল পরীক্ষা করেন মাত্র, হৃদয়ের বল দেখেন, প্রভুভক্তি, প্রভু প্রেম, প্রভু আজ্ঞা ও কর্ত্তব্যপালন করিতে সক্ষম কি না তাহারই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যখন সেই দয়ালু খোদাতালা দেখিলেন, হজরত এব্রাহিম (আ) তাঁহার আদেশ পালনে সক্ষম, প্রিয়তম পুত্রের জীবন-প্রদীপ তাঁহার আদেশে চিরদিনের তরে নির্ব্বাণ করিতে পারেন, তাঁহার প্রেম এত উন্নত যে, অপত্যস্নেহ তথায় স্থান পায় না—তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "হে প্রিয় এব্রাহিম! তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে। আমার আদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছ। এ কঠোর ভক্তি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। এসমাইলের পরিবর্ত্তে কোরবাণী করার জন্য বেহেশ্‌ত হইতে দুম্বা প্রেরণ করিলাম। ইহাকে কোরবাণী করিয়া এসমাইলকে কোরবাণী করার ফল লাভ কর।"

হজরত জিবরিলকে (আ) আদেশ করিলেন—"বেহেশ্‌ত হইতে একটি হৃষ্টপুষ্ট সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুম্বা লইয়া এসমাইলের পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে এব্রাহিমের ছুরিকার নীচে স্থাপন কর।"

হজরত জিবরিল (আ) স্বর্গ হইতে শ্বেতবর্ণের বড় চক্ষু ও শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা, যাহা ৪০ বৎসর স্বর্গে বিচরণ করিয়াছে, তাহা লইয়া যাইবার সময়ে মনে করিলেন, হয়ত কর্ত্তব্যপরায়ণ এব্রাহিম (আ) ইত্যবসরে প্রিয়পুত্রকে কোরবাণী করিয়া ফেলিতে পারেন, তন্নিবারণার্থে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তকবির বলিলেন—

"খোদাতালা মহান্" "الله اكبر"

"খোদাতালা মহান্" "الله اكبر"

হজরত এব্রাহিম (আ) ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, হজরত জিবরিল (আ) আসিতেছেন এবং হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে জবেহ করার জন্য স্বর্গীয় দুম্বা আনিতেছেন, উহা দেখিয়া তিনি বলিলেন—“لا اله الا الله والله اكبر” “আরাধনার উপযুক্ত একমাত্র খোদাতালা ভিন্ন আর কেহই নাই এবং খোদাতালা অতি মহান্।”

হজরত এসমাইল (আ) এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন—“الله اكبر ولله الحمد” “খোদাতালা অতি মহান্, তিনিই সকল প্রকার প্রশংসার উপযুক্ত”। তখন হজরত এব্রাহিম (আ) আনন্দের সহিত হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে সেই স্বর্গীয় দুম্বা খোদাতালার নামে কোরবাণী করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে বিঘ্ন প্রদান মানসে পাপাত্মা শয়তান পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় দুরাচারের প্রতি জামরাতল উলা নামক স্থানে সপ্তখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। ইত্যবসরে দুম্বা পলায়ন করে। তিনি তাহার

পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জামরাতল উস্তা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে পুনরায় দুরাত্মা শয়তান আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি পুনরায় তাহার প্রতি সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। দুম্বা পুনরায় পলায়ন করে, তিনিও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জামরাতল কোব্‌রা নামক স্থানে তাহাকে ধৃত করেন। সেখানেও দুর্ম্মতি শয়তান উপস্থিত হইবামাত্র তাহার প্রতি সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। সেই অবধি তাঁহার অনুকরণে হাজিগণ হজের সময় ঐ তিন স্থানে সপ্ত খণ্ড করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। পরে ঐ দুম্বাকে মিনার কোরবাণী ক্ষেত্রে বা মিনার মসজিদে কিম্বা মকামে এব্রাহিমে অথবা শাবে সবির নামক স্থানে আনয়ন করিয়া হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে খোদাতালার পবিত্র নামে কোরবাণী করিলেন। * অদ্যাবধি তাঁহার অনুকরণে কোরবাণী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

* স্বর্গীয় দুম্বার বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন,

পবিত্র কোরবাণী কার্য্য সম্পাদন করিয়া হজরত এব্রাহিম (আ)* আনন্দের সহিত তকবির পাঠ করিতে করিতে হজরত এসমাইল (আ)কে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ পবিত্র কোরবাণীর পুরস্কার স্বরূপে হজরত এব্রাহিম (আ), খলিলুল্লা ও হজরত এসমাইল (আ), জবেহুল্লা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তদবধি হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লার অনুকরণে এই কোরবাণীর প্রথা ও তকবির পাঠ প্রচলিত ও সোন্নত হইয়াছে।

বেহেশ্ত হইতে একটি দুম্বা যাহা ৪০ বৎসর তথায় প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহাই প্রেরিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, যে দুম্বা হজরত হাবিল (আ) কোরবাণীর জন্য দিয়াছিলেন তাহাই প্রেরিত হইয়াছিল। কেহ বলেন, শাবেসবির হইতে একটি পার্ব্বতীয় ছাগ বাহির হইয়াছিল, তাহাকেই হজরত এব্রাহিম (আ) খোদাতালার আদেশে হজরত এসমাইলের পরিবর্ত্তে কোরবাণী করিয়াছিলেন।
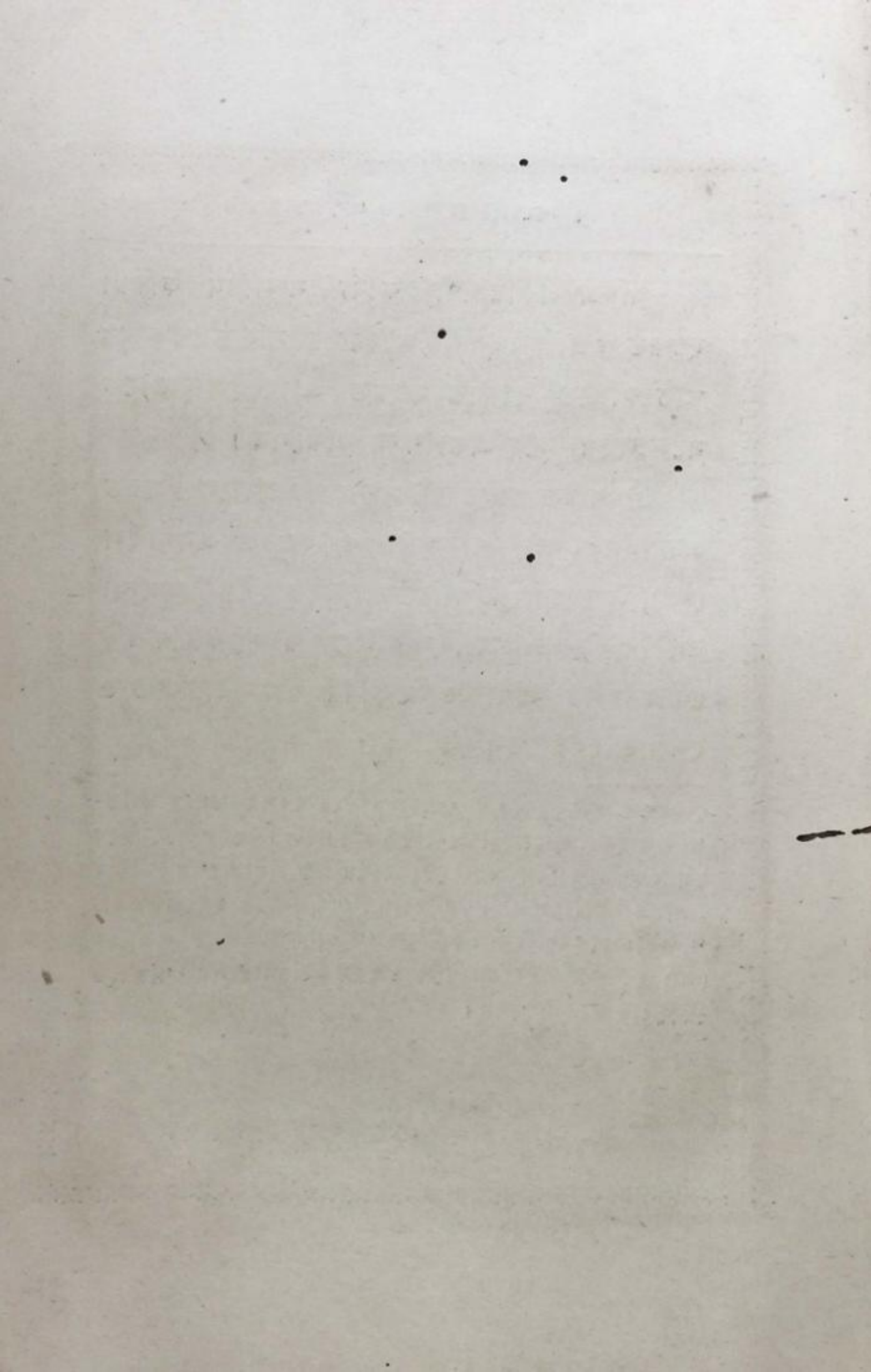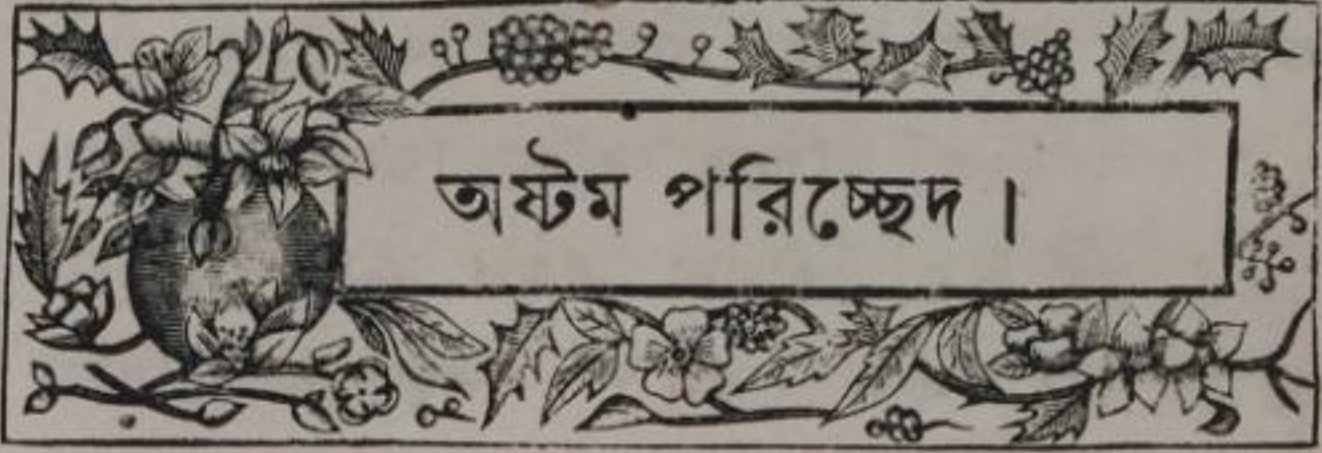
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঈদের নামাজ।

عن ابي سعيد الخدري رض ان رسول الله صلى الله
عليه و آله وسلم كان يخرج يوم الاضحى و يوم الفطر فيبدأ
بالصلوة فاذا صلى صلوته قام فاقبل على الناس وهم جلوس
في مصلاهم - الحديث * مسلم *

و عن البراء رض قال خطبنا النبي صلى الله عليه و
سلم يوم النحر فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان
نصلي ثم نرجع فننحر - الحديث *
متفق عليه *

হিজরীর প্রথম সন হইতে ঈদের নামাজের আদেশ হইয়াছে। হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে —হজরত (দং) পবিত্র-ধাম মদিনায় শুভাগমন

১। ঈদের নামাজ কোন্ সময়ে ও কোন্ ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে?

করিলে তত্রস্থ অধিবাসীগণকে বৎসরের মধ্যে দুই দিবস খেলা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এই দুই দিন তোমরা এরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত কর কেন?" তদুত্তরে তাহারা বলিল, "ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে আমরা এই দুই দিন ক্রীড়া-কৌতুকে অতিবাহিত করিতাম।" তখন হজরত (দঃ) আদেশ করেন, "পরম করুণাময় খোদাতালা উহা অপেক্ষা উত্তম দুই দিন তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; যথা—ঈদল আজহা (১) ও ঈদল ফেতর (২)।"

ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন

(১) জেলহজ্ মাসে যে ঈদ তাহাকে ঈদল আজহা বলে, আজহা অর্থ কোরবাণী, এই ঈদে কোরবাণী হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে ঈদল আজহা বলে।

(২) ঈদল ফেতর শওয়াল মাসে হইয়া থাকে, এই দিবস রোজার ফেতরা লওয়া হয় বলিয়া উহাকে ঈদল ফেতর বলে।

২। কাহার কাহার প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব?

ব্যক্তি অর্থাৎ যে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়, স্থানীয় স্থায়ী *, বয়ঃপ্রাপ্ত, পুরুষ ও স্বাধীন ব্যক্তির প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব।

৩। কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব নয়?

বিকৃতমনা, বিদেশী অর্থাৎ তিন মঞ্জেল বা ততোধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত ব্যক্তি, যে ১৫ দিনের অধিক কাল থাকিবে না বা থাকার ইচ্ছা করে না, অথবা ১৫ দিনের অধিক কাল থাকার ইচ্ছা না করা স্বত্ত্বেও কারণ বা কার্য্যবশতঃ তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, সে ব্যক্তিও বিদেশীর মধ্যে গণ্য। শরানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক,

* যে ব্যক্তি তিন মঞ্জেল বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত, যে ১৫ দিনের অধিক কাল থাকিবে বা থাকার ইচ্ছা করিয়াছে, যদি বিশেষ কারণ বা কার্য্যবশতঃ ১৫ দিনের কম সময়ের মধ্যেই তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু যে ১৫ দিনের অধিককাল থাকার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাকে স্থায়ী বলা যায়।

স্ত্রীলোক, অক্ষম অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, শয্যাগত, বৃদ্ধ ও ক্রীতদাস ইহাদের প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব নয়।

৪। নামাজের সময়।

চান্দ্র বৎসরের জেলহজ্ মাসের ১০ই, ১১ই ও ১২ই তারিখের প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণ উজ্জ্বল হইব্বার পর অর্থাৎ রক্তবর্ণ বিদূরিত হওয়ার পর হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত ঈদল আজহা নামাজের সময়। প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই তারিখেই নামাজ পড়া প্রশস্ত। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে দিন নামাজ পড়া না হয়, তাহা হইলে ১১ই তারিখে, সে দিনও পড়িতে না পারিলে অগত্যা ১২ই তারিখেই নামাজ পড়িবে। তৎপর আর পড়া সঙ্গত হইবে না। বিনা কারণে ১১ই কি ১২ই তারিখে পড়িলে নামাজ হইবে, কিন্তু তাহা ততদূর ফলপ্রদ হইবে না।

৫। নামাজের স্থান।

ঈদ্গাহে ঈদের নামাজ পড়া সোন্নত, স্থানীয় জুমা মস্জিদে স্থান অকুলান না হইলেও ঈদ্গাহে যাওয়াই প্রশস্ত।

যতদূর সম্ভব নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের লোক এক স্থানে সমবেত হইয়া একই ঈদ্‌গাহে নামাজ পড়া প্রশস্ত।

৬। ঈদ্‌গাহে যাওয়ার পূর্ব্বে কি কি কর্ত্তব্য ?

মেস্‌ওয়াক, ওজু ও স্নান করা, সুগন্ধি লেপন, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান, অঙ্গুরী ব্যবহার, যাহার যেরূপ অবস্থা তদনুসারে শরা সঙ্গত বেশভূষা করা ও কিছু আহার না করা কর্ত্তব্য।

৭। ঈদ্‌গাহে গমন কালে রাস্তায় যাহা কর্ত্তব্য।

পদব্রজে ঈদ্‌গাহ পর্য্যন্ত যাওয়াই প্রশস্ত। কোন যানবাহন আরোহণে যাইতে পারে, যে সকল বস্তু দেখা শরা নিষিদ্ধ তাহা দেখিতে বিরত থাকা ও অন্যমনস্ক না হওয়া কর্ত্তব্য। সমারোহ ও জাঁকজমকের সহিত যাইতে হয়, উচ্চৈঃস্বরে তক্‌বির * পড়িতে পড়িতে যাইতে হয়। ঈদ্‌গাহ পর্য্যন্ত এক পথে যাইয়া নামাজান্তে ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্ত্তন প্রশস্ত।

---

* الله اکبر الله اکبر لا اله الاالله, والله اکبر الله اکبر و لله الحمد

নামাজীগণের শ্রেণী সরল করণ, বিনা আজানে ও একামতে নামাজ আরম্ভ, ছয় তক্‌বিরের সঙ্গে দুই রেকাত নামাজের মনন, তক্‌বির তহরিমা করিয়া নাভির নিম্নে উভয় হস্ত স্থাপন, তস্‌বিহ পাঠ *, তৎপর তিনবার তক্‌বির পাঠ, প্রত্যেক তক্‌বিরে কর্ণমূল পর্য্যন্ত হস্তোত্তলন করিয়া হাত ছাড়িয়া দেওয়া, প্রত্যেক দুই তক্‌বিরের মধ্যে তিন তস্‌বিহ † পাঠের পরিমিত সময় নীরব থাকা, এবং জমাত বড় হইলে তিন্ তস্‌বিহ অপেক্ষা বেশী বিলম্ব করিয়া তক্‌বির পাঠ করা উচিত। এমাম ও মোকাব্বের উচ্চৈঃস্বরে তক্‌বির উচ্চারণ করিবেন, মোক্তাদী মনে মনে পাঠ করিবেন। তৃতীয় তক্‌বিরে হস্ত পুনরায় নাভির নিম্নে স্থাপন করিতে

৮। ঈদ্‌গাহে পৌছিয়া নামাজ কিরূপে পড়িতে হয়।

سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك *

سبحان الله †

হইবে। তৎপর এমাম মনে মনে তায়াওজ * ও তস্‌মিয়া † পাঠান্তে ফাতেহা উচ্চারণ করিয়া কোন এক সুরা পাঠ করিবে। সুরা কাফ অথবা অন্য কোন সুরা পাঠ করিবে, মোক্তাদীগণ নীরবে শ্রবণ করিবে, তৎপরে এমাম ও মোকাব্বের উচ্চৈঃস্বরে ও মোক্তাদী নীরবে তক্‌বির পাঠ পূর্ব্বক রুকু করিয়া তিনবার অথবা তদপেক্ষা অধিক বার বেজোড় তস্‌বিহ নিঃশব্দে পাঠ করিবে। তৎপরে আত্তাহিয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইবে এবং মোনাজাত করিয়া নামাজ শেষ করিবে। নামাজ শেষ করিয়া ইমাম খোৎবা পড়িবে।

ঈদল আজহার নামাজান্তে খোৎবা সোন্নত।

১। খোৎবা।

খোৎবা ছাড়াও ঈদের নামাজ সিদ্ধ হয়। ঈদের নামাজান্তে দুই খোৎবা পাঠ ও শ্রবণ করিতে হয়। উভয় খোৎবাই

* اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

† بسم الله الرحمن الرحيم

সোন্নত। নামাজের প্রথম খোৎবা পাঠও সিদ্ধ কিন্তু সোন্নত ত্যাগ হয় বলিঁয়া দূষণীয়। খোৎবা ব্যতীত যদিও ঈদের নামাজ পাঠ করা সিদ্ধ হয়, তথাপি খোৎবা ত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া পাপী হইতে হয়। এমাম যে পর্য্যন্ত খোৎবা পাঠ করে, সে পর্য্যন্ত মোক্তাদী পরস্পর বাক্যালাপ না করিয়া নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিবেন। এমাম খোৎবা পাঠ জন্য মেম্বরে আরোহণ করিয়া বসিবেন না, দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিবেন। উভয় খোৎবার মধ্যে অল্পক্ষণ বসিবেন। খোৎবা পাঠার্থে মেম্বরে আরোহণ করিয়া ৯ বার তক্‌বির পাঠ করিয়া খোৎবা আরম্ভ করিবেন। দ্বিতীয় খোৎবা ৭ সাতবার তক্‌বির পাঠ করিয়া আরম্ভ করিবেন। খোৎবা শেষ হইলে ৪ বার তক্‌বির পাঠ করিয়া মেম্বর হইতে অবতরণ করিবেন। খোৎবাতে কোরবাণী ও তক্‌বির তশ্‌রিক প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দিবেন। খোৎবার পর মনাজাত করিবেন না।

নামাজান্তে কোরবাণী করা অনিবার্য্য নয়, যে

১০। ঈদের নামাজান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে কর্ত্তব্য।

পথে ঈদ্‌গাহে যাওয়া যায় তৎপরিবর্ত্তে ভিন্ন পথে প্রত্যাগমন মোস্তাহাব। হজরত (দং) তাহাই করিতেন। তক্‌বির পাঠ করিতে করিতে প্রত্যাগমন মোস্তাহাব।

১১। গৃহে প্রত্যাগমনের পর কর্ত্তব্য।

নামাজান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আহার করা মোস্তাহাব। নামাজের পূর্ব্বে আহার করা মকরুহ তহরিমী নয়, যাহাদের প্রতি কোরবাণী ওয়াজেব তাহাদের নামাজান্তে কোরবাণী করিয়া কোরবাণীর মাংস দ্বারায় এফতার করা মোস্তাহাব। হজরত (দং) কোরবাণী অন্তে কোরবাণীর কলেজা দ্বারা এফতার করিতেন। সাহাবীগণ বলিয়াছেন, "ঈদল আজহার দিন বালক বালিকাগণকে হজরত (দং) নামাজের পূর্ব্বে আহার করিতে দিতেন না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও নামাজের পূর্ব্বে দুগ্ধপান করাইতে দিতেন না।"

জেলহজ্ মাসের ৯ই ইয়ম আরফা, ১০ই

১২। ইয়মল আরফা, নহর ও তশ্‌রিক।

তারিখ ইয়ম নহর ও ১৩ই তারিখ ইয়ম তশ্‌রিক। ১১ই ও ১২ই ইয়ম নহর ও ইয়ম তশ্‌রিক উভয়। ১০ই হইতে ১২ই পর্য্যন্ত ইয়ম নহর, ১১ই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত ইয়ম তশ্‌রিক।

الله اکبر الله اکبر لا اله الاالله, والله اکبر الله اکبر و لله الحمد *

১৩। তকরিব তশ্‌রিক কি?

ইহা ওয়াজেব।

১৪। তক্‌রিব তশ্‌রিক কাহার প্রতি ওয়াজেব?

স্থানীয় স্থায়ী লোক এবং যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষের জামাতে নামাজ পড়ে তাহাদের প্রতি তকরির তশ্‌রিক ওয়াজেব। যে বিদেশী স্থানীয় স্থায়ী এমামের এক্তেদা করিয়া নামাজ পড়িবে তাহাদের প্রতিও তকরিব তশ্‌রিক ওয়াজেব। এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি-গণও তক্‌বির তশরিক পাঠ করিতে পারে কিন্তু ওয়া-জেব নয়। স্ত্রীলোক মনে মনে তক্‌বির পড়িবে।

১৫। জুমার দিন ঈদ হইলে কি করিবে?

উভয় নামজ পড়িতে হইবে, কখনই কোন নামাজ ছাড়া যাইবে না।

১৬। ঈদের নামাজের সময় জানাজা উপস্থিত হইলে কি করিতে হইবে?

প্রথমে ঈদের নামাজ, তৎপর জানাজা, তৎপর খোৎবা পড়িতে হইবে।

১৭। এমাম নামাজ আরম্ভ করার পরে যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হয়, তবে কিরূপে নামাজ পড়িবে?

যদি এমাম তিন তকবির বলার পর কেহ সঙ্গী হয়, তবে সঙ্গী হওয়া মাত্র তিন তকরিব বলিবে ও হাত উঠাইবে। যদি রুকুতে সঙ্গী হয়, তবে রুকুতে যাইয়া তিন তকরিব বলিবে, কিন্তু ঐ তকবিরে হাত উঠাইবে না। যদি এক রেকাত পরে কি নামাজের শেষ ভাগে সঙ্গী হয়, তবে মসবুকের ন্যায় কেবল পড়িবে ও তকবির বলিবে ও হাত উঠাইবে।

——oo——

জমাত।

জমাত শব্দটী সমষ্টিবোধক। একাধিক লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়িলে তাহাকে জমাতে নমাজ পড়া বলে। জমাতে নমাজ পড়িলে অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া পবিত্র কোরাণ, হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ ঈদের নমাজ জমাতে পড়িবার আদেশ।

ইদানিং আমাদের দেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই—সে গ্রামটী ছোট হউক বা বড়ই হউক, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা অল্পই হউক বা বেশী হউক, এক একটী ঈদগাহ মাঠ করিয়া, কোন স্থানে মাঠ না করিয়া কেবল জুমাঘরেই ঈদের নমাজ পড়া হইতেছে। এরূপ অনেক জমাত হইয়া থাকে—যাহাতে লোকসংখ্যা ১০।১৫ বা ২০।২৫ কিম্বা ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী; অনেক জমাত এরূপ আছে—যাহাতে শতাধিক লোক হয় না। দুই চারি বা পাঁচশত লোকের জমাত, আমাদের

দেশের মধ্যে ২।৪টীর অধিক স্থানে হয় বলিয়া শুনা যায় না, অথচ পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী স্থানে এই সকল জমাত হইয়া থাকে যে, সকলে ইচ্ছা করিলে অতি সহজ চেষ্টাতেই তাহা একত্র করিয়া ২।১টী অতি বৃহৎ জমাতে পরিণত করিতে পারেন; কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। তাহার কারণ কি? তাহার এই মাত্র কারণ দেখা যায় যে, বড় জমাতের ফল অনেকেই অবগত নহেন এবং সেই সকল গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের সহিত মিলিতে ইচ্ছা করেন না এবং নিজগ্রামে স্বতন্ত্র জমাত না থাকা অপ্রাধান্য মনে করেন। বোধ হয়, বড় জমাতের সুবিধা ও তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইলে অনেকেই বড় জমাতে নমাজ পড়িতে প্রস্তুত হইতে পারেন। এই স্থানে সংক্ষেপে তদ্বিষয় কিছু বলিতেছি।

প্রথমতঃ বড় জমাতের সওয়াবের বিষয় শ্রবণ করুন—একজন লোক একা এক রেকাত নমাজ

পড়িলে এক রেকাতের সওয়াব পাইবেন। দুই জন হইলে তাহার নাম জমাত, দুইজন হইলে প্রত্যেক এক রেকাতে সাতাইশ রেকাত নমাজের সওয়াব পাইবেন। তিন জন হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেক রেকাতে ৫৪ চুয়ান্ন রেকাতের সওয়াব পাইবেন। চারিজন হইলে প্রত্যেকে প্রতি রেকাতে একাশী রেকাতের সওয়াব পাইবেন. পাঁচজন হইলে প্রত্যেকে এক রেকাত নমাজ পড়িলেই একশত আট রেকাত নমাজের সওয়াব পাইবেন অর্থাৎ যেন একশত আট রেকাত নমাজ পড়িয়াছেন। এইরূপ ক্রমে যতই বেশী হইবেক, প্রত্যেক এক জনের সঙ্গে সাতাইশ রেকাত করিয়া নমাজের সওয়াব বাড়িবে এবং তাহা প্রত্যেকে পাইবেন। দেখুন দেখি, ক্রমে জমাত বেশী হইলে, কত সওয়াব বৃদ্ধি হয়। ছোট জমাতে নমাজ পড়িলে যে পরিমাণ সওয়াব হইবে, খুব বড় জমাতে নমাজ পড়িলে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ সওয়াব বেশী অথচ পরিশ্রম

সমান। এরূপ স্বল্পায়াসে অধিক ফল কেন ছাড়েন।

এইত গেল, সওয়াবের কথা, এতদ্ভিন্ন আরও ফল আছে। লোক যতই বেশী হইবে ততই জমাত বড় হইবে। যত বেশী লোকে প্রার্থনা করিবে, ততই খোদাতায়ালার নিকট তাহা গ্রহণীয় হইবে। মনে করুন, একটী লোকে একটী প্রার্থনা করিল, সেই প্রার্থনাটীই দশ কুড়ি জনে করিল, আবার সেই প্রার্থনাটীই শতেক দুইশত লোকে করিল আর হাজার দুই হাজার লোকে করিল, আবার সেই একই প্রার্থনা দশ কুড়ি হাজার লোকে একত্রে করিল, এস্থলে কাহার প্রার্থনা অধিক মঞ্জুর হইবে? সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, অধিক লোকের প্রার্থনাই খোদাতালা মঞ্জুর করেন। তদ্ভিন্ন যত বেশী লোক একস্থানে একত্র হওয়া যায়, তন্মধ্যে ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকই থাকেন। যদিও বর্ত্তমান কালে সিদ্ধ মহা-পুরুষগণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপিও তাঁহারা

না থাকিলে পৃথিবী রসাতলে যাইত। এত পাপ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না; সুতরাং অধিক লোক একত্র হইলে অল্প হউক বেশী হউক তাঁহাদের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে, সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনা খোদাতালা বেশী গ্রহণ করিবেন।

যে কার্য্যে যতদূর কষ্ট স্বীকার করা যায় ততই সেই কার্য্য খোদাতালার প্রিয় হয়, অধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সমাগত না হইলে, জমাত বড় হইতে পারে না। যাঁহারা যতদূর হইতে আসেন, তাঁহারা তত বেশী কষ্ট স্বীকার করেন, কাজেই তাঁহারা বেশী পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন। জমা-তের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একতা বদ্ধমূল হয়, তাহাতে সমাজের অশেষ প্রকার মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে; দেখুন, প্রথমতঃ দিবারাত্রে এক পরিবার বা বাড়ীর লোক পাঁচবার ফরজ নমাজ উপলক্ষে জমাতের জন্য একত্র হইলে, তাহাতে পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে আত্মীয়তা ও

প্রণয় বৃদ্ধি হয়, তৎপর সপ্তাহে জুম্মার নমাজ উপলক্ষে এক বা একাধিক গ্রামের লোক একত্র হইয়া থাকেন। তাহাতে পরস্পর সপ্তাহে এক-বার সাক্ষাৎ হইয়া প্রতিবেশীগণের সহিত কোন-রূপ বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারে না। অসা-ক্ষাতে কোনরূপ মনোমালিন্যের কারণ জন্মিলে, সাক্ষাতে তাহা নষ্ট হইয়া প্রণয় স্থাপিত হয়। যাহার সহিত কোন রূপ আত্মীয়তা নাই, পুনঃ পুনঃ দেখা সাক্ষাতে বন্ধুত্ব জন্মিয়া আত্মীয়তা অপেক্ষা অধিক প্রণয় জন্মে। আর দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, নিতান্ত নৈকট্য আত্মীয়ের সঙ্গেও প্রণয় থাকে না। জুম্মার জমাতের জন্য খোদা-তালা তাঁহার পবিত্র বাক্য কোরাণ শরিফে আদেশ করিয়াছেন—

"জুম্মার আজান শুনিলে, সাংসারিক কার্য্য ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া যাইবে।" বৎসরান্তে দুইবার অর্থাৎ দুই ঈদে অনেকগুলি জনপদের লোক ঈদের জমাত উপলক্ষে একত্র হইলে পর-

স্পর দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইয়া একটি সমগ্র দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ দূর হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অবস্থা জানিতে পারা যায়। অনেক শিক্ষিত ও বহুদর্শী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, নানাপ্রকার নূতন শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় জমাত হজের, জীবনের মধ্যে তাহা একবার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্পন্ন করা ফরজ কার্য্য, তাহাতে জাতীয় একতা ও সদ্ভাব স্থাপিত হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়া অনেক উচ্চ বিষয় শিক্ষা ও বহুদর্শীতা জন্মে, এবং জাতীয় জীবন গঠিত হয়। এই জন্যই জমাতের এত মাহাত্ম্য ও উপকার। এই জমাত প্রথার জন্য এক কালে সমগ্র ইসলাম জাতি একতাবলে বলীয়ান্ হইয়া, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সমগ্র সভ্য দেশেই নিজে প্রভুত্ব ও রাজত্ব

বিস্তার করিয়াছিলেন এবং সকল জাতিরই আদর্শ হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এস্থলে তদ্বিষয় অধিক বর্ণনা করা বাহুল্য। জমাতে যেরূপ খোদাতালা পরকালে পুণ্য দেন, সেইরূপ ইহ-কালেও অনেকরূপ সাংসারিক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক, খোদা-তালার বন্ধু শেষ নবি হজরত মহাম্মদ মস্তফাও (দ) ঈদের নামাজ মাঠে পড়িতেন। মাঠে পড়ার অর্থ এই—জমাত বেশী হওয়া। তিনি মদিনার পবিত্র মসজেদ নববীতে পড়িতেন না। ঐ পবিত্র মসজেদে এক রেকাত নমাজ পড়িলে পঞ্চাশ হাজার রেকাতের সওয়াব পাওয়া যায়, তাহাও উপেক্ষা করিয়া তিনি মাঠে যাইতেন। মাঠে গেলে মসজেদ অপেক্ষা অধিক লোক একত্র হইতে পারে, সুতরাং জমাত অনেক বড় হয়, ঐরূপ জমাতের প্রত্যেকের প্রত্যেক রেকাতের সওয়াব মসজেদে নববীর প্রত্যেক রেকাতের সওয়াব

অপেক্ষা অধিক না হইলে তিনি কেন মাঠে যাইতেন? মাঠের নমাজের ও বড় জমাতের এতদূর মাহাত্ম্য, পুণ্য ও ফল থাকা সত্বেও আমাদের দেশের মুসলমান ভ্রাতাগণ সে বিষয় অমনোযোগী হইয়া জুম্মা মসজেদে বা পাড়ায় পাড়ায় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ছোট ছোট মাঠ করিয়া জমাত স্বষ্টি করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া ঈদের নমাজ পড়িতেছেন, ইহাতে সওয়াব কম ও জাতীয় একতা নষ্ট হইতেছে; স্থতরাং একতার অভাবে জাতীয় বল হ্রাস হইয়া তাহার বিষময় ফল— পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ঘটিয়া জাতীয় অনিষ্টের পরাকাষ্ঠা হইতেছে। ইহার প্রতিকার ব্যক্তি বিশেষ বা জনপদ বিশেষের অধিবাসীর চেষ্টায় হইতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা উচিত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমগ্র জাতির এক অংশ বিশেষ, এইরূপ বহু অংশের সমষ্টি সমগ্র জাতি, স্থতরাং যত লোক চেষ্টা করিবে, সমগ্র

জাতির তত অংশের কার্য্য হইবে। সেই অংশ যত ক্ষুদ্রই হউক না, তথাপিও আংশিক কার্য্য হইবে বলা যাইতে পারে; আংশিক না হইলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সম্পূর্ণ কার্য্য হওয়ার জন্যই আংশিক আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল—

কোন এক রাজার বাড়ীতে একটি অতি বৃহৎ ভোজের ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমারোহে অনেক পরিমাণ দুগ্ধের আবশ্যক হওয়ায় দুগ্ধ রাখিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাগণের প্রতি আদেশ করা হয় যে, প্রত্যেকের এক এক কলসী দুগ্ধ উক্ত চৌবাচ্চায় দিতে হইবে। এক নির্দ্দিষ্ট রজনীতেই উহা দুগ্ধে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। পরদিন প্রত্যুষে ঐ দুগ্ধ দ্বারা সমারোহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। প্রত্যেক প্রজাই মনে করিল, রাজার অধিকারে সহস্র সহস্র প্রজা আছে। সকলেই এক এক কলসী দুগ্ধ আনিয়া দিবে, সুতরাং সহস্র সহস্র

কলসী দুগ্ধের মধ্যে সে যদি এক কলসী জল দেয় তাহা কিছুতেই জানা যাইবে না, এবং তাহাতে কোনরূপ ক্ষতিও হইবে না। সকলেই এই বিশ্বাসে নির্দ্দিষ্ট রজনীতে এক এক কলসী জল দিয়া গিয়াছে। প্রাতে দেখা গেল, চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ, সকল কাজই নষ্ট হইয়া গেল, প্রত্যেকের সামান্য সুবিধার জন্য হঠাৎ অতি মহৎ কার্য্য নষ্ট হইল। এস্থলে সেই কথা। আমরা যদি মনে করি, আমাদের এক জনের বা এক গ্রামবাসীর অথবা নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের অধিবাসীর চেষ্টায় কি হইতে পারে? অন্যান্য সকলেও তাহাই মনে করিতে পারে, তাহাতে সমগ্র চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ হওয়ার ন্যায় সমগ্র দেশের জাতীয় একতা নষ্ট হইয়া অনর্থপূর্ণ হইবে। তাহা না করিয়া আমরা যদি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ক্রমে সকলেই চেষ্টা করিবে। এক দিনে না হউক, ক্রমে চেষ্টার সুফল অবশ্যই ফলিবে। আশা করি, প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতাই এই বিষয়ে সাধ্যানুসারে

চেষ্টা করিবেন। ইহাতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ফল লাভ করিবেন।

ভাই বঙ্গীয় মুসলমানগণ! তোমরা যাঁহার ওম্মত, সেই পবিত্রাত্মা শেষ মহাপুরুষের পবিত্র উপদেশাবলীর অনুসরণ ও তাঁহার পবিত্র কার্য্য-কলাপের অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর। তাহাতে তোমাদের ইহ ও পরকালের মঙ্গল হইবে। তোমরা হিংসা দ্বেষ ও বিবাদ বিসম্বাদের বশবর্ত্তী হইয়া যেমন সেই অন্তিমের কাণ্ডারীর উপদেশাবলীর উপেক্ষা করিতেছ, সেইরূপ দিন দিন তোমারা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইবার উপক্রম করিয়াছ। তাই বলি, ভ্রাতৃগণ! তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় ধর্ম্মের প্রকৃত আদেশ পালন করিয়া একতাবলে বলীয়ান হও এবং পরকালের পথ প্রশস্ত করিয়া লও। আর বঙ্গদেশ হইতে ইসলামের পবিত্র নাম ডুবা-ইবার চেষ্টা করিও না।

——oo——
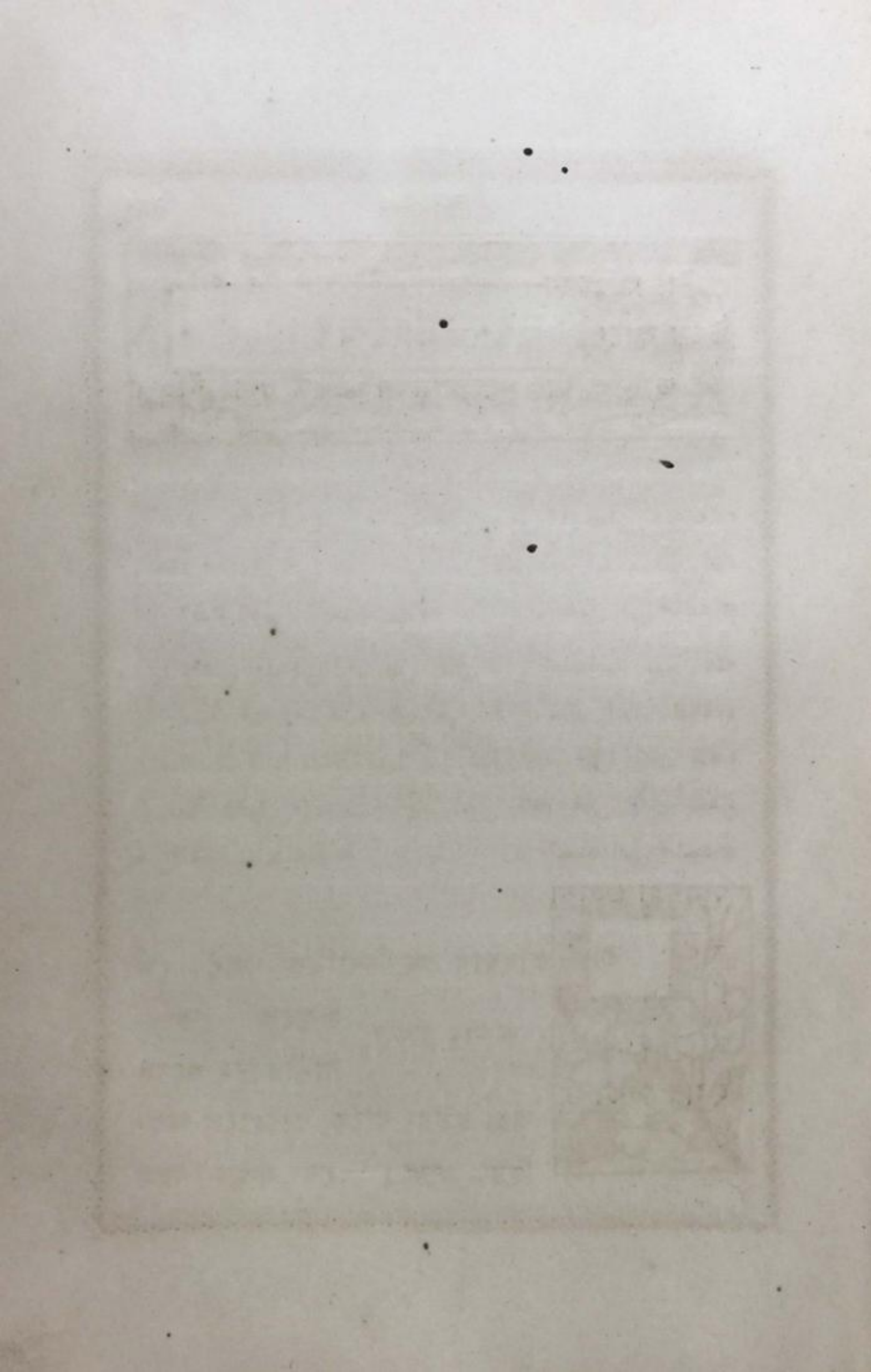
নবম পরিচ্ছেদ।

কোরবানী।

عن عائشة رض قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم - الحديث * ترمذي ابن ماجه *

وعن زيد بن ارقم رض قال قال اصحاب رسول الله يا رسول الله ما هذه الاضاحى قال سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام قالوا فمالنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة * احمد ابن ماجه *

আজহিয়া কাহাকে বলে?

অজহিয়ার আভিধানিক অর্থ—যে জন্তকে কোর-বানীর দিন জবেহ করা হইয়া থাকে, তাহাকে অজ-হিয়া বলে। যে জন্তুর বয়স

নির্দ্ধারিত করিয়া কোরবানীর দিন জবেহ করা হইয়া থাকে—যেমন, ছাগ এক বৎসর বয়সের কম না হয়, দিন নিরূপিত করা অর্থাৎ জেলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখ হইতে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত—সেই জন্তুকে শরাতে অজহিয়া অর্থাৎ কোরবানী বলে।

রোক্‌নে অজহিয়া কাহাকে বলে?

যে জন্তুকে কোরবানী করার আদেশ আছে, তাহাকে কোরবানীর মননে কোরবানীর সময়ে জবেহ করাকে রোক্‌নে অজহিয়া বলে।

অজহিয়া কয় প্রকার?

অজহিয়া দুই প্রকার। ওয়াজেব ও নফল। ধনবানের প্রতি ওয়াজেব আর দরিদ্রের প্রতি নফল। মানসিক করিলে অর্থাৎ যদি কেহ বলে যে, আমি খোদাতালার উদ্দেশে একটী ছাগ বা উট কোরবানী করিব, তাহা হইলে সে দরিদ্র হউক বা ধনবান হউক, তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। দরিদ্র বা প্রবাসী ব্যক্তি যদি কোরবানী করে,

তাহা হইলে তাহার কোরবানী নফল কোরবানী, কেননা, সে ব্যক্তি কোরবানীর জন্য মানসিক করে নাই। দরিদ্র ব্যক্তি কোরবানীর মননে জন্তু ক্রয় করিলে তাহা তাহার প্রতি ওয়াজেব কোরবানী হইবে। কোন ব্যক্তি একটী ছাগ ক্রয় কালে কোরবানীর মনন করে নাই, পরে যদি কোরবানীর মনন করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না, সে ব্যক্তি ধনী হউক বা দরিদ্র হউক। ধনী লোক কোরবানীর জন্তু ক্রয় কালে কোরবানীর মনন ও মানসিক না করিলেও তাহার কোরবানী ওয়াজেব কোরবানী হইবে।

যাহার প্রতি ছদকা ও ফেৎরা ওয়াজেব।

কোরবামীর ওয়াজেব হইবার সর্ত্ত কি কি?

বয়োপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান হওয়া আবশ্যক করে না। অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পত্তি হইতে তাহার অভিভাবক কোরবানীর জন্তু ক্রয় করিয়া কোরবানী দিবে। সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কের কোরবানীর মাংস ছদকা

করিবে না; যদি কেহ করে, তাহার জন্য তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। মুসলমানের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব, কাফেরের প্রতি ওয়াজেব নহে। পূর্ব্বে কাফের ছিল, পরে মুসলমান হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। ক্রীতদাসের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে। সাহেবে নেছাব অর্থাৎ সম্পত্তিশালী ও স্থানীয় স্থায়ী হওয়া আবশ্যক, প্রবাসী হইলে হইবে না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব।

সাহেবে নেছাব বা ধনী কাহাকে বলে?

আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে কোরবানীর সময়ে যাহার হস্তে এ পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে, যাহাতে নেছাব পূর্ণ হয় কিম্বা নেছাব হইতে অধিক হয়, তাহাকে সাহেবে নেছাব বা ধনী বলা হয়।

আবশ্যকীয় ব্যয় কি কি?

বাসের ঘর, গৃহের সরঞ্জাম, পরিধানের বস্ত্র, আহারীয় সামগ্রী, আরোহণের চতুষ্পদ জন্তু, পড়িবার পুস্তক, ব্যবহারীয় অস্ত্র, চাকুরীয় অস্ত্র ইত্যাদি।

ঘটি, বাটি, থালা, বদনা, গ্লাস, ডেগ, হাড়ি, দা, কুড়াল, খোন্তা, কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতি। কিন্তু রৌপ্য কি স্বর্ণ নির্ম্মিত থালা, গ্লাস ও বাটি প্রভৃতি থাকিলে কোরবানী দিতে হইবে।

গৃহের সরঞ্জাম কি কি ?

২০০ দেরেম রৌপ্য কি ২০ মেছকাল স্বর্ণে নেছাব পূর্ণ হয়। কিন্তু কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ যদি থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মূল্য ধরিয়া নেছাব পূর্ণ করিতে হইবে। ২০০ দেরেম রৌপ্য ও ২০ মেছকাল স্বর্ণ আমাদের দেশে এই সময়ে ৪৮॥০ টাকা ও ৬ তোলা ১১ মাসা ১ রতির কিঞ্চিৎ অধিক স্বর্ণ হইবে।

নেছাব কি ?

যদি তাহার ঋণ পরিশোধ কালে তাহার নিকট নেছাবের পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর কোরবানী ওয়াজেব হইবে না।

ঋণী ব্যক্তি কোরবানী করিবে কি না ?

ব্যবসার জন্য পণ্যদ্রব্য মজুত থাকিলে যদি উহার

ব্যবসায়ীর উপর কি সর্ত্তে কোরবানী ওয়াজেব হইবে ?

মূল্য ধরিয়া নেছাব পূর্ণ হয়. তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। আর যদি এরূপ ঘটনা সংঘটন হয় যে, এক ব্যক্তির মাল আছে উক্ত মাল তাহার নিকট নাই, অন্য স্থানে আছে এবং যদি সেই মাল কোরবানীর সময়ে তাহার হস্তগত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না।

কোরবানী ওয়াজেব হওয়ার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

এক ব্যক্তির নিকট দুই শত দেরেম আছে, এক বৎসর পরে সে যদি উহা হইতে ৫ দেরেম জাকাৎ দেয়, তাহা হইলে তাহার নিকট ১৯৫ দেরেম রহিল, এ অবস্থায় তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে কি না ? ইহার সম্বন্ধে আমাদের আছহাবগণ হইতে কোনরূপ রওয়ায়েত পাওয়া যায় না। তবে শেখ জাফরাণী সাহেব বলেন, তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

একজন ধনী লোক কোরবানীর জন্য ছাগল ক্রয় করার পরে যদি সেই ছাগলটি হারাইয়া যায়, এ দিকে কোরবানীর সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যদি তাহার নিকট নেছাবের পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি সেই নিরুদ্দিষ্ট ছাগলটি কোরবানীর দিন পাওয়া যায়, এ দিকে যদি তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে না।

যদি কাহারও নিকট দুই শত দেরেম মূল্যের কোরাণ শরিফ থাকে, আর সে যদি উহা পাঠ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপর কোর-বানী ওয়াজেব হইবে না। যদি সে ব্যক্তি উহা নিজে পাঠ করিতে না পারে বা তাহার পুত্র বড় হইলে পড়িবে বলিয়া ক্রয় করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। কেবল কেতাব থাকিলে ধনী বলিয়া গণ্য হইবে

না, যদি প্রত্যেক রকম কেতাব দুই খানি থাকে, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত কেতাবের মূল্য যদি নেছাবের বেশী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে ও তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন খক্স দুইশত দেরেম দিয়া আরোহণ করিবার জন্য একটী গাধা ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে। আর যদি কোন ব্যক্তির ঘরে দুইটী কামরা আছে, একটি শীতের সময় ও অপরটি গ্রীষ্মের সময় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি ঐ ঘরে তিনটি কামরা থাকে, এবং ঐ তৃতীয় কামরাটির মূল্য দুই শত দেরেম হয়. তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

গাজির অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধকারীর দুইটি অশ্ব থাকিলে ধনী হইবে না, তিনটি অশ্ব থাকিলে ধনী হইবে এবং তাহাকে কোরবানী দিতে হইবে।

আর যদি তাহার এক একখানি অস্ত্র থাকে, তাহা হইলে ধনী হইবে না, যদি প্রত্যেক রকমের দুই-খানি অস্ত্র থাকে, আর তাহাদের মূল্য যদি দুইশত দেরেম হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে এবং তাহার কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে।

কোন জমিদারের এক অশ্ব ও এক গাধা থাকিলে তাঁহাকে সাহেবে নেছাব বলা যাইবে না। যদি তাঁহার দুইটী অশ্ব কিম্বা দুইটী গাধা থাকে, আর তাহাদের প্রত্যেকের মূল্য যদি দুই শত দেরেম হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সাহেবে নেছাব বলা যাইবে ও তাঁহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

কৃষকের দুইটী বলদ ও চাষবাসের যন্ত্রাদি থাকিলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে না। কিন্তু যদি দুই শত দেরেম মূল্যের একটী গাভী থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে ও তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

এক ব্যক্তির নিকট তিন প্রকারের কাপড় আছে, এক প্রকার কাপড় সে সর্ব্বদা পরিধান করে, দ্বিতীয় প্রকারের কাপড় কোন স্থানে যাইবার সময়ে পরিধান করে, আর তৃতীয় প্রকারের কাপড় ঈদের সময়ে পরিধান করে, তাহাকে সাহেবে নেছাব বলা যাইবে না। যদি তাহার নিকট চারি প্রকারের কাপড় থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধনী বলা যাইবে ও তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে।

নাবালকের কোর-বানী।

বয়োপ্রাপ্ত পুত্র ও স্ত্রীর পক্ষ হইতে কোরবানী করা ওয়াজেব নহে। যদি উহাদের মধ্যে কেহ কোরবানী করিবার জন্য অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে কোরবানী করিতে হইবে। যদি নাবালকের সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে নাবালকের পক্ষ হইতে পিতার কোরবানী করা ওয়াজেব। হজরত এমাম আবুহানিফার (রহঃ) মতানুসারে নাবালকের অভিভাবকের

উপর নাবালকের পক্ষ হইতে কোরবানী করা ওয়াজেব। উক্ত কোরবানীর মাংস ছদকা করিবে না, উহা সেই নাবালক ভোজন করিবে। যদি সে সমুদয় মাংস ভোজন করিতে না পারে, তাহা হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিস লইবে, যাহাতে সেই নাবালকের লাভ হয়। কোরবানীর সময় যে নাবালক, বয়োপ্রাপ্ত হয়, আর সে যদি ধনী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব।

কাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে?

মক্কাবাসী হাজিগণ যখন এহরাম বান্ধে তখন তাহাদের প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে, এবং প্রবাসীর প্রতিও কোরবানী ওয়াজেব নহে।

কাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব ও কাহার প্রতি নহে?

যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে দরিদ্র, ক্রীতদাস ও কাফের থাকে, শেষে ধনী, ক্রীতদাস হইতে মুক্ত ও মুসলমান হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব।

যদি কোন ধনী ব্যক্তি প্রথম সময়ে কোরবানী না করে, পরে যদি দরিদ্র হইয়া যায় বা প্রবাসী হয় কিম্বা মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব নহে।

যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্রাবস্থায় কোরবানী করিল, শেষে ধনী হইল, তখন তাহাকে পুনর্ব্বার কোরবানী করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর সময়ে ধনী ছিল, তখন কোরবানী করে নাই, তৎপরে সে দরিদ্র হইল, তখন তাহার নিকট একটি ছাগ-লের মূল্য পাওনা রহিল, যখন তাহার হস্তে ঐ ছাগলের মূল্য আসিবে, তখন তাহাকে তাহা ছদকা দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর সময়ে ধনী ছিল এবং সেই সময়ে কোরবানী করিবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট কোরবানী পাওনা রহিল না অর্থাৎ তাহার কোর-বানী মাফ হইয়া গেল।

যদি কেহ কোরবানীর সময়ে কোরবানী না করিয়া ছাগল কিম্বা কোরবানীর জন্তুর মূল্য ছদকা দেয়, তাহা হইলে তাহার কোরবানী আদায় হইবে না। !

কোরবানীর জন্তু কে জবেহ করিবে?

কোরবানীর সময়ে নিজে কোরবানীর জন্তু জবেহ করিবে কিম্বা অন্যকে জবেহ করিতে অনুমতি দিবে।

কোরবানী ও ছদকা।

কোরবানীর সময়ে যদি কেহ কোরবানী করিতে না পারে, তাহা হইলে পরে তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে। একটী ছাগলের মূল্য ছদকা দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য একটি ছাগল ক্রয় করিবার পর উহাকে কোরবানী করিবার মনন করে, আবার যদি ঐ ব্যক্তি অন্য একটি ছাগল কোরবানীর জন্য ক্রয় করে, তাহা হইলে প্রথম ছাগলটা ঐ ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে পারে [এমাম আবু হানিফা ও এমাম

মহম্মদ (রহঃ)] আর দ্বিতীয় ছাগলটী যদি প্রথম ছাগলটি অপেক্ষা কম মূল্যের হয়, তাহা হইলে প্রথম ছাগল অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাগলটির মূল্য যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে অর্থ ছদকা করা তাহার পক্ষে ওয়াজেব।

কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু ক্রয় করিল, কিন্তু ঐ জন্তু হারাইয়া যাওয়াতে আবার অন্য জন্তু ক্রয় করিল, কিন্তু কোরবানীর সময়ে যদি নিরুদ্দিষ্ট জন্তুটি পুনঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে জন্তুটি ইচ্ছা কোরবানী করিতে পারে। যদি সে ব্যক্তি ধনী হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে দুইটিই কোরবানী করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর ১০টী কোরবানী ওয়াজেব করিয়া লয়, অর্থাৎ সে যদি ১০টী কোরবানী করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি দুইটার অধিক ওয়াজেব হইবে না। কেননা, হাদিস শরিফে দুইটির উল্লেখ আছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর মননে একটী ছাগল ক্রয় করে, পরে উহা বিক্রয় করে, আবার কোরবানীর সময়ে যদি অন্য একটী ছাগল ক্রয় করে, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে তিন প্রকারের কথা উঠিতে পারে। প্রথম—কোরবানীর মননে একটী ছাগল ক্রয় করা। দ্বিতীয়—কোরবানীর মনন ব্যতীত একটী ছাগল ক্রয় করা, তৎপরে কোরবানীর মনন করা। তৃতীয়—কোরবানীর মনন ব্যতীত একটী ছাগল ক্রয় করিয়া পরে নিজ মুখে কোরবানী ওয়াজেব করিয়া লওয়া অর্থাৎ নিজ মুখ হইতে বলিল যে, খোদাতালার জন্য আমার উপর ওয়াজেব, ইহাকে এ বৎসর কোরবানী করিব। ঐ সম্বন্ধে প্রকাশ্য রওয়ায়েত এই যে, প্রথমতঃ—নিজ মুখ হইতে কোরবানীর অঙ্গীকার না করার জন্য উক্ত ছাগলে কোরবানী হইবে না, কিন্তু এমাম ইউসফ ও এমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে কোরবানীর জন্য কেবল মনন করিলেই যথেষ্ট, মুখে বলার কোন আব-

শ্যক করে না। দ্বিতীয়তঃ—এমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে এমাম হাছান সাহেব রওয়ায়েত করেন যে, ঐ ছাগলটী ক্রয়ের সময়ে কোরবানীর মনন করা হয় নাই বলিয়া উহাতে কোরবানী হইতে পারে না। যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ ছাগলটী বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। তৃতীয়তঃ—সকলের মতে ঐ ছাগলটী কোরবানী করিতে হইবে, কেননা, উহা ক্রয় করিবার পরে নিজ মুখে উহাকে কোরবানী দিব বলিয়া অঙ্গীকার করায় কোরবানী ওয়াজেব হইয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি একটী ছাগল ক্রয় করিবার সময়ে কোরবানীর মনন করে, আর যদি কোরবানীর সময়ে মনন ব্যতীত কোরবানী করে, তাহা হইলে তাহার কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসা করিবার জন্য একটী ছাগল ক্রয় করিয়া পরে নিজ মুখে উহাকে কোরবানী করা ওয়াজেব করিয়া লয়, তাহা হইলে উক্ত

ব্যক্তির প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে। যদি উক্ত ব্যক্তি কোরবানী না করে, তাহা হইলে কোরবানীর সময় গত হইলে উক্ত ছাগলটি ছদকা করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি ছাগল কোরবানী করিবার নিমিত্ত মনন করে, কিন্তু তখন যদি কোন ছাগল নির্দ্দেশ না করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজেব হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি উক্ত ছাগলের মাংস কিছুমাত্র খাইতে পারিবে না। যদি খায়, তাহা হইলে যে পরিমাণে মাংস খাইবে, সেই পরিমাণ মাংসের মূল্য তাহার পক্ষে ছদকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

যদি কেহ বলে যে, আমি খোদার উদ্দেশে একটা ছাগল কোরবানী করিব, কিন্তু সে যদি উট কিম্বা গরু কোরবানী করে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

তিন দিন পর্য্যন্ত কোরবানীর সময় অর্থাৎ

কোরবাণীর সময়। ১০ই জেলহজ্জ হইতে ১২ই জেলহজ্জ পর্য্যন্ত। মোট কথা ১০ই-তারিখের সূর্য্যোদয় হইতে ১২ই তারিখের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোরবানী করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রথম তারিখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি ১০ই তারিখে সন্দেহ হয়, তবে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করা উচিত। যদি অপেক্ষা করে, তবে মস্তাহাব। মস্তাহাব কোরবানীর মাংস কিছুমাত্র খাওয়া যাইবে না, সবই ছদকা করিতে হইবে। কিন্তু যে জন্তু জবেহ করিবে, জবেহ করিবার সময়ে সে জন্তুর যে মূল্য নির্দ্ধারিত করা যায় আর ঐ জন্তু জীবিত থাকিলে উহার যে পরিমাণ মূল্য হইত, উভয় মূল্যই ছদকা করিতে হইবে।

সহরবাসিদের পক্ষে নামাজের পর আর পল্লীবাসিদের (যে স্থানে ঈদ, জুমা, ফৎয়া, ফারাজ প্রভৃতি হইতে পারে না) পক্ষে সূর্য্যোদয়ের পরে কোরবানী করা সিদ্ধ।

যদি ১০ই তারিখে কোন কারণবশতঃ কিম্বা

বিনা কারণে কেহ নামাজ পড়িতে না পারে, তাহা হইলে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে নামাজের পূর্ব্বে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

যদি কোন সহরে কোন কারণবশতঃ নামাজ পড়াইবার জন্য এমাম উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সহরে সূর্য্যোদয়ের পরে কোরবানী করিলে সিদ্ধ হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি ১০ই তারিখকে আরফার দিন বলিয়া সংবাদ দেয়, কিন্তু পরে যদি উক্ত দিন ১০ই তারিখ ঠিক বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে উক্ত দিন কোরবানী করিলে সিদ্ধ হইবে।

কোন্ সময়ে কোর-বানী করা উচিত?

দিবা ভাগে কোরবানী করা কর্ত্তব্য, কেননা, তাহা হইলে কোরবানীর জন্তুর সমস্ত শিরা কর্ত্তিত হইতে পারে। আর রাত্রিতে কোরবানী করা অনুচিত, কেননা রাত্রে সমস্ত শিরা কর্ত্তিত হইল কি না, ঠিক জানা যায় না।

ঈদের চন্দ্র দেখা।

এমামের চন্দ্র দর্শনের সাক্ষ্যতার আর-ফার দিন নামাজ পড়া ও কোর-বানী করা সিদ্ধ। আর যদি কেহ চন্দ্র দর্শনের সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে নামাজ ও কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যদি বয়োপ্রাপ্ত লোকে বলে—এই দিন ঈদল আজহার দিন অর্থাৎ ১০ই তারিখ, তাহা হইলে কোরবানী করিবে। আর যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকে ঐরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না। তবে সূর্য্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলে সেই সময়ে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

প্রবাসীর কোর-বানী।

যদি কোন ব্যক্তি প্রবাসে গমন কালে তাহার পক্ষ হইতে কাহারও প্রতি কোর-বানী করিবার ভার দিয়া যায় তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এমাম নামাজ হইতে অবসর না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রবাসীর পক্ষ হইতে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

সহর ও গ্রামে কোরবানীর নিয়ম।

যদি কোন ব্যক্তি ঈদের নামাজ পড়িবার জন্য গ্রাম হইতে সহরে যাইবার সময়ে নিজ পরিবারস্থ লোক-দিগকে বলিয়া যায় যে, তাহার পক্ষ হইতে কোর-বানী করিবে; তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরই কোরবানী করা উহাদের প্রতি আদেশ।

যদি কোন ব্যক্তি সহরের বাহিরে থাকে, আর যদি তাহার পরিবারবর্গ সহরে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে এমাম যে পর্য্যন্ত নামাজ হইতে অবসর প্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত উহার পক্ষ হইতে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি এক সহরে অবস্থিতি করে, আর তাহার পরিবারবর্গ অন্য সহরে অবস্থিতি করে, এরূপ অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিবার জন্য পরিবারস্থ লোক-দিগকে আদেশ করে, তাহা হইলে ঐ সহরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এমাম নামাজ হইতে অবসর না হইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোরবানী করা সিদ্ধ

হইবে না। কিন্তু আবু হাছান (রহঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, যে পর্য্যন্ত উভয় সহরে নামাজ পড়া না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সহর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আর তথায় ঈদের নামাজের পূর্ব্বে তাহাকে কোরবানী করে, এবং সে স্থানে যদি প্রবাসীর জন্য কছর পড়া কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের বা পুত্রের জন্য একটী ছাগ ক্রয় করে, আর যদি উহা কোরবানী না করে, এমন কি, কোরবানীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ছাগ বা উহার মূল্য ছদকা দেওয়া ওয়াজেব।

যদি কোন ব্যক্তি একটি ছাগ কোরবানী করিব বলিয়া ওয়াজেব করিয়া লয় কিম্বা কোরবানী করিবার মনে উহা ক্রয় করে, কিন্তু সে যদি উহাকে উপযুক্ত সময়ে কোরবানী না করে,

এদিকে যদি কোরবানীর সময় অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ছাগটিকে জীবিতাবস্থায় ছদকা করিবে। আর ঐ ছাগলের মাংস ভক্ষণ করা তাহার পক্ষে সিদ্ধ নহে। আর যদি উক্ত ছাগলকে বিক্রয় করে, তাহা হইলে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে। আর যদি জবেহ করিয়া উহার মাংস ছদকা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু উক্ত ছাগের জীবিতাবস্থার মূল্য যদি জবেহ করার পর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ মূল্য অধিক হইবে, তাহা ছদকা করিতে হইবে। আর যদি কিছু মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে। যদি উক্ত ব্যক্তি সেই বৎসর কোরবানী না করে, এমন কি দ্বিতীয় বৎসর কোরবানীর সময় উপস্থিত হয়, আর সেই সময়ে যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ ছাগলটী কোরবানী করে, তাহা হইলে সেই কোরবানী সিদ্ধ হইবে না। যদি কোরবানীর পর ঐ ছাগলের মাংস বিক্রয়

করে, তাহা হইলে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তাহার আত্মীয় স্বজনগণকে বলিয়া যায় যে, তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিও। কিন্তু যদি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির জন্য একটী ছাগল কোরবানী করা কর্ত্তব্য। আর যদি কোরবানীর জন্য কোন জন্তু বা জন্তুর মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর দিন ধনবান হয়, আর ঐ ব্যক্তি কোরবানীর সময় থাকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি কোরবানীর সময় অতীত হইয়া গেলে মরিয়া যায়, তাহা হইলে উহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে একটী ছাগলের মূল্য ছদকা দিতে হইবে,

এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুকালে কোরবানীর মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া যাইতে হইবে।

যদি কোন সহরবাসী তাহার উকিলকে তাহার পক্ষ হইতে কোরবানী করিবার আদেশ দিয়া সহরের বাহিরে চলিয়া যায়, আর যদি ঐ উকিল কোরবানীর জন্তু সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া জবেহ করে, এবং সেই সময়ে যদি সেই লোকটি সহরের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে সেইখানে উকিলের কোরবানী সিদ্ধ হইবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি সহরে ফিরিয়া আসে, এবং উকিল যদি উহা জানিয়াও সহরের বাহিরে কোরবানী করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উকিলের কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না। আর যদি উকিল ঐ ব্যক্তির সহরে আসার সংবাদ জানিতে না পারিয়া কোরবানী করে, তাহা হইলে এমাম আবু ইউসক (রহঃ) সাহেবের মতে উক্ত কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

ধনবান. কাঙ্গাল সকলেই খাইতে পারে।

কোরবানীর মাংস কে কে খাইতে পারে?

কোরবানীর মাংসের তৃতীয়াংশ ছদকা করিতে হয়, কিন্তু পরিবার বড় হইলে কিছুই ছদকা দিতে হইবে না, আপনারাই আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। এমন কি, মৎস্যের ন্যায় কোরবানীর মাংস শুষ্ক করিয়া রাখিতে পারিবে।

কোন্ কোন্ জন্তু কোরবানী করিবার আদেশ আছে।

ছাগ, মেষ, গরু ও উট এই সকল পশুর কোরবানী দেওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল পশুর পুরুষই হউক বা স্ত্রীই হউক, কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

যদি কোন হরিণ জাতীয় পশু উট কিম্বা ছাগের সঙ্গে সঙ্গম করে, আর তাহাতে যে শাবক হয়, তাহাকে পুরুষ গণ্য করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, যদি কোন পুরুষ হরিণ কোন ছাগীর সহিত সঙ্গম করে, তাহা হইলে ঐ হরিণের ঔরসে যদি ছাগ জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাতে কোরবানী সিদ্ধ

হইবে। কিন্তু যদি হরিণ জন্মে, তাহা হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

কোরবানীর পশুর বয়স নির্ণয় আছে কি না?

কোরবানীর পশুর মধ্যে ছাগ ও মেষ ১ বৎসরের, গো ও মহিষ ২ বৎসরের, উষ্ট্র ৫ বৎসরের হওয়া আবশ্যক। ইহার কম বয়সের হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু উহা অপেক্ষা বয়স অধিক হইলে কোন দোষ ঘটিবে না। যদি উপযুক্ত কোরবানীর পশু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ছয় মাসের ছাগও কোরবানী করিতে পারা যায়।

কোন্ পশুতে কয় জন ব্যক্তির কোরবানী হইতে পারে?

একটি ছাগল বা মেষে একজনের আর একটি গরু বা উষ্ট্রে ৭ জনের পর্য্যন্ত অংশী হইয়াও কোরবানী হইতে পারে। সাত জনের অধিক অংশী হইলে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

কি প্রকারের পশু কোরবানী দেওয়া নিষেধ?

কোরবানীর পশুর কোন দোষ থাকিলে তাহাতে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন পশুর শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ মধ্যে লালটা ভগ্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ পশুতে কোরবানী হইতে পারিবে আর যদি উহার শৃঙ্গের মূল দেশ হইতে মাংসসহ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যে পশু সঙ্গম করায় অসমর্থ কিম্বা কাশ-রোগগ্রস্ত, কিম্বা বৃদ্ধ অবস্থা প্রযুক্ত শাবক দানে অক্ষম কিম্বা যাহাকে দাগ দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা যাহার শাবক আছে, কিম্বা বিনা রোগে যে পশুর স্তনে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে কোর-বানী করা সিদ্ধ।

কানা, অন্ধ, খোঁড়া বা রুগ্নতাপ্রযুক্ত কোর-বানীর স্থানে যাইতে অক্ষম, এরূপ পশু কোর-বানী করা সিদ্ধ নহে।

যে পশুর কাণ ছোট, উহা কোরবানী করা সিদ্ধ। আর যাহার এক কাণ কাটা কিম্বা জন্মা-বধি একটি কাণ আছে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

এমাম আবু হানিফা (রহঃ) হইতে এমাম মহম্মদ (রহঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিন ভাগের এক ভাগ হইতে যদি কিছু কম পরিমাণের দোষ যে পশুতে আছে, তাহা কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ হইতে যদি বেশী দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কোর-বানী সিদ্ধ হইবে না।

যে ছাগের দন্ত নাই, সে যদি চরিতে ও ঘাস খাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে। আর যদি সে চরিতে ও ঘাস খাইতে না পারে, তাহা হইলে তাহা কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন পাগলা গরু চরিতে ও ঘাস আদি খাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে। আর যদি কোন গরু চুলকানী বা তদনুরূপ রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু যদি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

যে পশুর নাক কাটা, সে পশু কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। যে পশুর স্তন কাটা কিম্বা যে পশু শিশু শাবককে দুগ্ধ পান করাইতে অক্ষম বা যাহার স্তন শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না।

যে ছাগের জিহ্বা কাটা, অথচ তাহার ঘাস খাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না, এরূপ ছাগ কোর-বানী করা সিদ্ধ। আর গরুর জিহ্বা কাটা হইলে সেই গরু কোরবানী করা সিদ্ধ নহে।

যে পশু কেবল নাপাক বস্তু ভক্ষণ করে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ নহে।

যে পশু কৃশ, এবং যাহার শরীরের চর্ব্বি শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। আর যদি চর্ব্বি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোরবানী করা যাইতে পারে। যদি কোন পশু ক্রয় করিবার সময়ে কৃশ থাকে, পরে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা হইলে এমাম মহম্মদের (রহঃ) মতে তাহাকে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে।

নপুংসক ছাগ কোরবানী করা সিদ্ধ নহে। কেননা, উহার মাংস সিদ্ধ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি একটী হৃষ্টপুষ্ট ছাগল কোরবানীর জন্য ক্রয় করিল, পরে যদি ছাগলটী কৃশ হইয়া যায়, আর যদি ক্রেতা ধনবান হয়, তাহা হইলে ঐ ছাগলটী তাহার পক্ষে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না, আর যদি ক্রেতা দরিদ্র হয়, তাহা হইলে ঐ ছাগল কোরবানী দিলে সিদ্ধ হইবে।

যদি কেহ কোরবানীর জন্য ছাগল ক্রয় করিবার সময়ে ছাগলটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিয়া ক্রয় করে, তৎপরে উহার নিকট আসিয়া যদি সেই ছাগলটি অন্ধ হইয়া যায় বা দুই কর্ণ বা লাঙ্গুল কাটিয়া যায় অথবা এরূপ খোঁড়া হইয়া যায় যে, গমনাগমনের শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ছাগলকে কোরবানী করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধ হইবে না। তাহার অন্য একটি ছাগল ক্রয় করিয়া কোরবানী করিতে হইবে। কিন্তু এই নিয়ম দরিদ্রের পক্ষে নহে।

যদি কেহ কোন পশুকে কোরবানী করিবার জন্য কোরবানীর স্থানে লইয়া যাইবার সময়ে পথি-মধ্যে উক্ত পশুর পা ভাঙ্গিয়া যায়, সে যদি সেই স্থান হইতে কোরবানীর স্থানে যাইতে না পারে, তাহা হইলে সেই স্থানেই উক্ত পশুকে কোরবানী করিলে উক্ত ব্যক্তির কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

পাঁঠা অপেক্ষা খাসি কোরবানী করা ভাল, কেননা পাঁঠার মাংস অপেক্ষা খাসির মাংস অতি উত্তম।

কোরবানীর পশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোরবানার পূর্ব্ব দিবস কোরবানীর পশুকে বান্ধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কোর-বানীর সময়ে পশুকে কোরবানীর স্থান পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার সময়ে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া কর্ত্তব্য।

যদি কেহ কোরবানীর জন্য ছাগী ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার দুগ্ধ দোহন করা মকরুহ এবং উহার লোম কর্ত্তন করাও মকরুহ। আর উক্ত দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করা সিদ্ধ নহে।

আর যদি কোরবানী করার পূর্ব্বে ঐ ছাগীটীর দুগ্ধ দোহন করে কিম্বা লোম কর্ত্তন করে, তাহা হইলে উহা বিক্রয় না করিয়া ছদকা করিবে।

কোরবানীর মাংস বিক্রয় করিলে কি করিতে হইবে?

কোরবানীর মাংস বিক্রয় করিয়া চামড়ার থলি ক্রয় করা সিদ্ধ নহে। কিন্তু যদি উহার দ্বারা তরকারি আদি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। আর কোরবানীর মাংসের পরিবর্ত্তে মাংস ক্রয় করা সিদ্ধ। মোট কথা—খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে খাদ্য দ্রব্য আর অখাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অখাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা সিদ্ধ।

কোরবানীর চামড়ার ব্যবহার।

যদি কোন ব্যক্তি কোরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা থলি প্রস্তুত করিয়া গৃহকর্ম্মের জন্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে। আর যদি ঐ থলি ভাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু ঐ ভাড়ার টাকা ছদকা দেওয়া তাহার প্রতি ওয়াজেব।

কোরবানীর পশুর চর্ম্ম, খুর ও লোম কি করিতে হইবে?

কোরবানীর পশুর চর্ম্ম কিম্বা খুর কিম্বা লোম প্রভৃতি বিক্রয় করা বা আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে। যদি কেহ কোরবানীর পশুর লোম, খুর প্রভৃতি স্মরণ চিহ্নের জন্য যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত লোম বা খুর প্রভৃতি কাহাকেও উত্তরাধিকারী করিয়া যাওয়া বা ফেলিয়া দেওয়া সিদ্ধ নহে, বরং উহা কোন দরিদ্রকে দান করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

কোরবানীর পশুর শাবকগুলি কি করিতে হইবে?

যদি কোরবানীর পশু, শাবক প্রসব করে, তাহা হইলে ঐ শাবককেও জবেহ করিতে হইবে। কিন্তু আছহাবগণ বলেন যে, দরিদ্র লোকের প্রতি উক্ত রূপ আদেশ, ধনবানের প্রতি নহে।

ঐ শাবকটিকে উহার মাতার অগ্রে বা পরে জবেহ করা সিদ্ধ হইবে। যদি জবেহ না করিয়া জীবিতাবস্থায় ছদকা করিয়া দেয় বা উহাকে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ছদকা করিয়া দেয়, তাহা

হইলে সিদ্ধ হইবে। আর যদি কোরবানীর সময়ে জবেহ না করে, এদিকে যদি কোরবানীর সময় চলিয়া যায়, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় উক্ত শাবক ছদকা দিতে হইবে। আর যদি ঐ শাবককে উহার মাতার সঙ্গে জবেহ করে, তাহা হইলে ঐ শাবকের মাংস ভক্ষণ করা সিদ্ধ। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেব রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ঐ শাবকের মাংস ভক্ষণ না করিয়া উহা ছদকা দিতে হইবে। আর যদি কেহ ভক্ষণ করে তাহা হইলে সেই পরিমাণ মাংসের মূল্য ছদকা করিতে হইবে। আর যদি উক্ত শাবকটি ঐ ব্যক্তির নিকট থাকিয়া বড় হয়, এবং দ্বিতীয় বৎসর কোরবানীর সময়ে সে যদি উহাকে জবেহ করে, তাহা হইলে তাহার কোর-বানী সিদ্ধ হইবে না। তাহাকে অন্য পশু কোর-বানী করিতে হইবে। আর যাহাকে জবেহ করা হইয়াছে, তাহাকে ছদকা করিয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু উহাকে কোরবানী করাতে উহার যে

পরিমাণ মূল্য ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

কোরবানী সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটী কথা।

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুত্র ও স্ত্রীর পক্ষ হইতে একটী উট কোরবানী করে, আর যদি পুত্রটী অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউসফ (রহঃ) সাহেবদের মতে উক্ত কোরবানী সিদ্ধ হইবে। কিন্তু হাছান এবনে জিয়াদ (রহঃ) রওয়ায়েত করিতেছেন—যদি উক্ত পুত্রটী বয়োপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার অনুমতি অনুসারে কোরবানী করিলে সিদ্ধ হইবে। আবার যদি কেহ অনুমতি দেয়, আর কেহ অনুমতি না দেয়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে কোরবানী করা সিদ্ধ হইবে না। আবার যদি কোন ব্যক্তি নিজের ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের এবং পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে কোর বানী করে, কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে কেহ অনুমতি দেয় আর কেহ যদি অনুমতি না দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নিজের পক্ষ হইতে কোরবানী সিদ্ধ

হইবে না ; এবং তাহার পুত্র ও পবিবারবর্গের পক্ষ হইতেও কোরবানী সিদ্ধ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তির কোরবানীর পশু, তাহার বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ কোরবানী করে, আর যদি সেই পশুর অধিকারী উহার মূল্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

যদি দুই ব্যক্তি ভুলক্রমে পরস্পর পরস্পরের কোরবানীর পশু কোরবানী করিয়া ফেলে, তবে উভয়ের কোরবানী সিদ্ধ হইবে। আর প্রত্যেকে স্ব স্ব পশুর চামড়া গ্রহণ করিবে। আর যদি উভয়ে কোরবানীর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্ষমা চাহিবে। যদি উহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে ছাগলের মূল্য দিবে। কিন্তু যদি এইরূপে কোর-বানীর সময় অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে।

যদি দুই ব্যক্তি দুইটী ছাগল ক্রয় করিয়া এক ঘরে রাখিয়া দেয়, পরে যদি একটী ছাগলকে সন্দেহ প্রযুক্ত উভয়েই নিজের বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে প্রত্যেকে সেই ছাগলটীর অর্দ্ধেক অংশ পাইবে। আর উহাদের কোরবানী সিদ্ধ হইবে না। আর যে ছাগলটির উপর উহাদের দাবী নাই সেই ছাগলটী বয়তল-মাল যাইবে। আর যদি উট বা গরু লইয়া ঐরূপ বিবাদ হয়, তাহা হইলে সেই পশু হইতে উভয়ের কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

যদি চারি জন লোক কোরবানীর জন্য চারিটি ছাগল ক্রয় করিয়া এক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে, পরে যদি উহাদের মধ্যে একটি ছাগল মরিয়া যায়, তখন যদি এরূপ ঘটনা ঘটে যে, কাহার ছাগল মরিল, তাহার ঠিক হইল না, তাহা হইলে ওরূপ অবস্থায় অবশিষ্ট তিনটি ছাগল বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দিয়া অপর চারিটি ছাগল ক্রয় করিতে হইবে এবং কোরবানীর সময়ে একজন অপরকে

তাহার পক্ষ হইতে জবেহ করিতে অনুমতি দিবে। তাহা হইলে সকলেরই কোরবানী সিদ্ধ হইবে।

কোরবানীর মাহাত্ম্য।

এবনে আব্বাস রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন, ১০ই জেলহজ্জ তারিখে যেরূপ পূণ্য কাজ হয়, এরূপ আর কোনও তারিখে হয় না। ইহাতে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন যে, জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ করা অপেক্ষাও কি ভাল? পয়গম্বর সাহেব উত্তর করিলেন, জেহাদও উহা অপেক্ষা ভাল নহে এবং লায়লা-তল-কদর অপেক্ষাও উহার মাহাত্ম্য অধিক। আরও রওয়ায়েত আছে যে, কোরবানীর পশু ক্রয় করিতে ১০ দেরেম ব্যয় করা, সহস্র দেরেম দান করা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

পরিশিষ্ট।

জবিহ্ সম্বন্ধে মত ভেদ ও মীমাংসা।
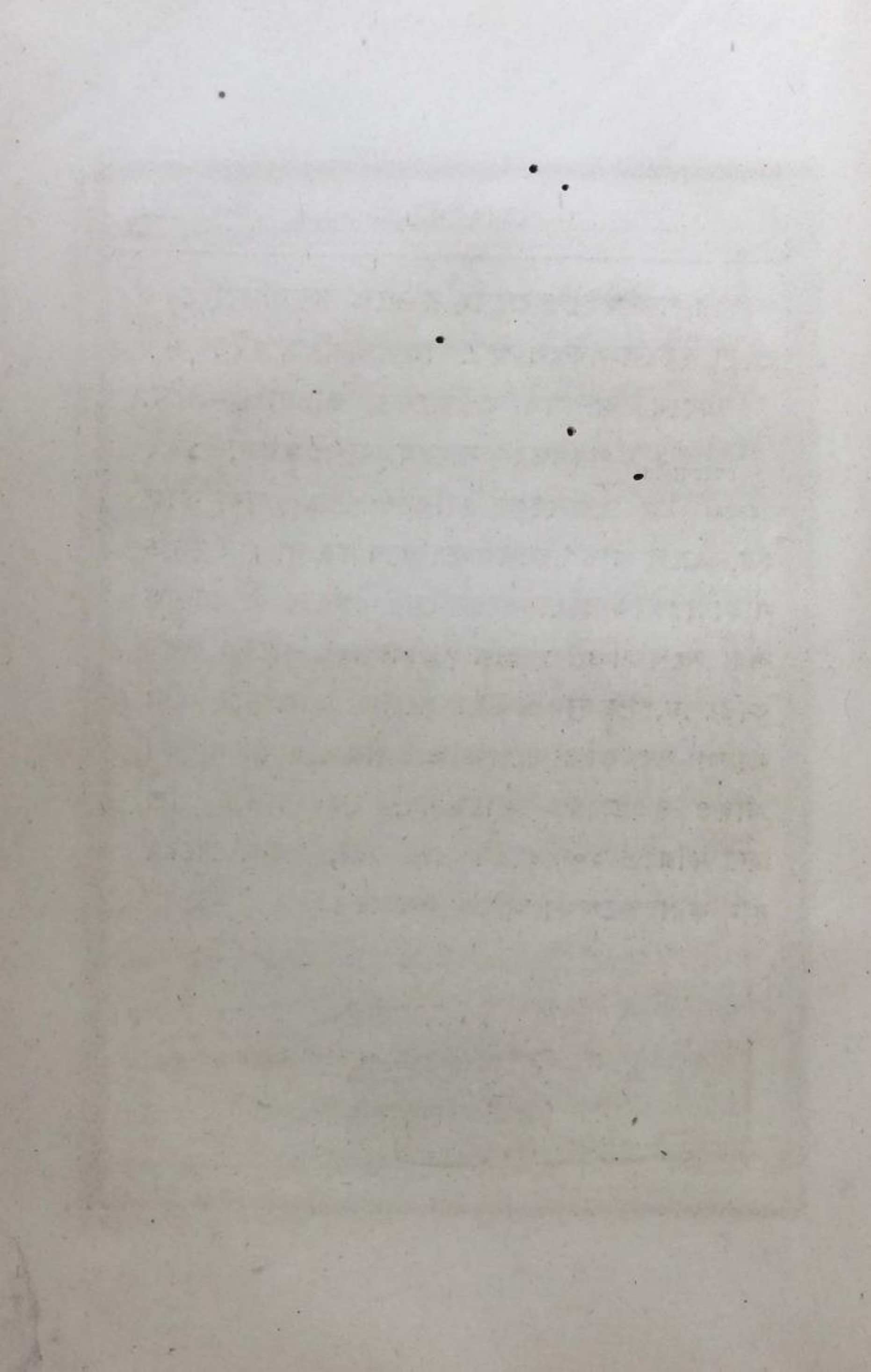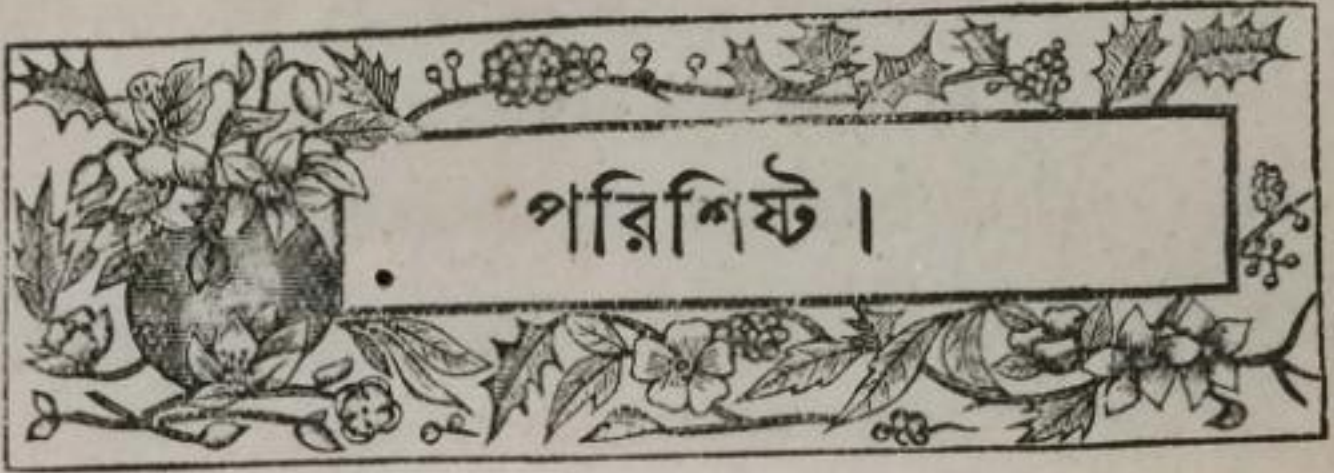
হজরত এব্রাহিমের (আ) দুই পুত্র---হজরত এসমাইল (আ) ও হজরত এসহাক (আ)। এই উভয় পুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রকে কোরবানী করার জন্য খোদা-তালা আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভয়ানক মত ভেদ আছে। পবিত্র কোরাণ শরিফে যে স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে সে স্থানে কোন পুত্রের নামোল্লেখ নাই এবং কোন সবল হাদিসও এ বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই ইহাতে এত মত বিভিন্নতা জন্মিয়াছে। ইহুদী ও

খৃষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন করেন। মোসলমানগণ মধ্যে কেহ হজরত এস-হাক (আ), কেহ হজরত এসমাইলের (আ) পক্ষাবলম্বী।

উভয় পক্ষেই সাহাবি ও তাবেয়ীন আছেন। যাঁহারা হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন করেন, তন্মধ্যে কাব নামক এক ব্যক্তি যিনি হজরত ওমরের (আ) খেলাফত কালে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি একদা হজরত আবু হোরেরাকে (আ) বলেন, এব্রাহিমের (আ) পুত্র এসহাকের (আ) ঘটনা আপনাকে শ্রবণ করাইতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে হজরত আবু-হোরেরা (আ) শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—যখন হজরত এব্রাহিম (আ) তাঁহার পুত্র হজরত এসহাককে খোদাতালার পবিত্র নামে কোরবানী করিতে স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তৎকালে শয়তান মনে করিল যে, এই সময় এব্‌রাহিমকে (আ) গোল-

যোগে ফেলিতে না পারিলে আর কাহাকেও এরূপ গোলযোগে ফেলিতে পারিব না। এই সংকল্প করিয়া শয়তান এরূপ এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া হজরত এব্‌রাহিমের (আ) স্ত্রী হজরত সারার নিকট উপস্থিত হইল, যাহাকে তিনি চিনিতেন। যখন হজরত এব্‌রাহিম (আ) হজরত এসহাককে কোরবানী করার জন্য সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন পাপমতি শয়-তান হজরত সারার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, অদ্য প্রাতে এব্‌রাহিম (আ) এসহাককে (আ) সঙ্গে লইয়া কোথায় গিয়াছেন ? হজরত সারা তদুত্তরে বলিলেন,—তিনি নিজ কোন কার্য্যে যাইয়া থাকিবেন। তখন শয়তান শপথ করিয়া বলিল—তিনি অন্য কোন প্রয়োজনে যান নাই, হজরত এসহাককে (আ) জবেহ করার জন্য লইয়া গিয়াছেন। হজরত সারা বলিলেন—ইহা কি সম্ভব ? তিনি নিজ পুত্রকে কেন জবেহ করিবেন ! ! শয়তান বলিল—আমি শপথ করিয়া

বলিতেছি, তিনি সেই মানসেই গিয়াছেন, কারণ তিনি বলেন—তাঁহার প্রভু খোদাতালা ঐ কার্য্য করার জন্য তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। হজরত সারা বলিলেন—খোদাতালা যদি তাঁহার প্রতি এসহাককে (আ) জবেহ করার আদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অতি সৎকার্য্য করিতেই তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান ও কর্ত্তব্য কার্য্য। তখন শয়তান ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে স্থান হইতে হজরত এসহাকের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"এব্রাহিম (আ) তোমাকে জবেহ করার জন্য লইয়া যাইতেছে।" হজরত এসহাক বলিলেন—"তিনি কেন আমাকে জবেহ করিবেন?" তখন শয়তান শপথ পূর্ব্বক বলিল—তোমার পিতা বলেন "তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি তোমাকে জবেহ করার আজ্ঞা করিয়াছেন"। হজরত এসহাক (আ) বলিলেন, যদ্যপি খোদা-তালা তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে প্রভুর আজ্ঞা পালন করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য। শয়তান সেখানেও অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ভগ্নহৃদয়ে হজরত এব্‌রাহিমের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, অদ্য আপনি এসহাককে (আ) সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইতেছেন? তিনি উত্তর করিলেন, কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে যাইতেছি। তখন শয়তান বলিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি তাহাকে জবেহ করিতে লইয়া যাইতেছ। হজরত এব্‌রাহিম (আ) বলিলেন "আমি কেন তাহাকে জবেহ করিব?" শয়তান বলিল, তুমি বল ঐ কার্য্য করার জন্য তোমার প্রতি খোদাতালার আদেশ হইয়াছে। হজরত এব্‌রাহিম (আ) বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে অবশ্যই আমি খোদাতালার আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিব।

তৎপর যখন হজরত এব্‌রাহিম (আ) হজরত এসহাককে কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়া জবেহ

করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন খোদাতালা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া হজরত এসহাকের (আ) পরিবর্ত্তে বড় একটি কোরবানীর পশু প্রেরণ করিলেন। হজরত এসহাকের (আ) প্রতি অহি (আদেশ) করিলেন যে, তুমি এক্ষণে আমার নিকট কোন প্রার্থনা কর, তুমি যে প্রার্থনা করিবে তাহা আমি পূর্ণ করিব। তখন হজরত এসহাক (আ) খোদাতালা সমীপে প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময় প্রভো! সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যে কেহ তোমার দাস মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে ও শেষ দিন পর্য্যন্ত করিবে, তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল একমাত্র তোমাকেই পূজা করিয়াছে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও উপাস্য ভাবে নাই তাহাদিগকে স্বর্গবাসী করিও।

ইহুদি ও খৃষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) বংশীয় ও আরবগণ হজরত এসমাইলের (আ) বংশীয়। আরবগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের শত্রুতা হওয়ায়, তাহারা প্রকৃত ঘটনা গোপন

করিয়া হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে হজরত এসহাকের (আ) সম্বন্ধে এই ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহাবিগণ ইহাদের নিকট ইতিহাস অবগত হওয়ায় অনেকে বলেন, হজরত এব্রাহিম (অ) খোদাতালার আদেশে হজরত এসহাককে (আ) কোরবানী করিয়াছিলেন।

হজরত এসমাইল (আ) যে প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কৃত), তাহা য দচ পবিত্র কোরাণশরিফে তাঁহার নাম উল্লেখ নাই কিন্তু ভাবে তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যায়, সেই জন্য সাহাবি ও ত বেয়ীন এবং কোরাণশরিফের টিকাকারগণ দৃঢ় রূপে হজরত এসমাইলকে (আ) প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কৃত) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা কোরাণশরিফ হইতে এইরূপ প্রমাণ দেন—পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা বলিয়াছেন—

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا

بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ط

قَالَ يَا اَبَتِ افعل مَا تُؤْمَرُ * سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ الله

مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَهُ

اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰوءُ الْمُبِيْنُ * وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ * وَ

تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ * سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ * كَذٰلِكَ

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ * اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ *

আমি এব্রাহীমকে এক সহিষ্ণুপুত্রের সুসংবাদ দিয়াছি, তৎপর যখন পুত্রের কিছু বয়ক্রম বৃদ্ধি হইল এবং পিতার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন (হজরত) এব্রাহিম (আ) বলিলেন,—বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন তোমাকে খোদাতালার পবিত্র নামে জবেহ করিতেছি। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ—ইহাতে তোমার ইচ্ছা কি? পুত্র বলিল, "পিতঃ! আপনার প্রতি যে

আদেশ হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করুন। খোদাতালার ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে সহিষ্ণুই দেখিতে পাইবেন।” তৎপরে পিতা পুত্র উভয়ে যখন আঁদেশ পালন জন্য প্রস্তুত হইলেন— পিতা জবেঁহ করার জন্য মৃত্তিকার দিকে মাথা করিয়া পুত্রকে ভুতলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন উহাকে আমার আদেশ পালনপ্রিয় বোধ হইল। আমি এব্রাহিমকে (আ) বলিলাম “হে এব্রাহিম! তুমি নিজের স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে, আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ পদ মর্য্যাদা দিব। আমি আমার পুণ্যবান দাসগণকে এই রূপই প্রতিদান দিয়া থাকি, অবশ্য ইহা পরিষ্কার পরীক্ষা ছিল এবং বড় একটি কোরবানীর জন্তু এসমাইলের পরিবর্ত্তে দিয়াছিলাম এবং এসমাইলের পরবর্ত্তীগণ মধ্যে এই আলোচনা রাখিয়াছি। সমগ্র জগতে এই আলোচনা হইতেছে যে, এব্রাহিমের (আ) প্রতি সালাম, আমি পুণ্যবান দাসগণকে এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ

নাই। এব্রাহিম আমার বিশ্বাসী দাস মধ্যে গণ্য।”

ইহার পরেই পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা বলিতেছেন।—

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ *

আমি এব্রাহিমকে (আ) তাহার পুত্র এসহাকের (আ) পূণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিই। এখন দেখা যাইতেছে, পবিত্র কোরাণশরিফের এই বর্ণনা প্রথম সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ, তৎপর এই কোরবানীর গল্প বলিতেছেন, সুতরাং এই গল্প সেই সহিষ্ণু পুত্রের প্রতি প্রজুয্য হইতেছে। সেই সহিষ্ণু পুত্রের সহিষ্ণুতার গল্প শেষ করিয়া হজরত এসহাকের (আ) সুসংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং এ গল্প হজরত এসহাক সম্বন্ধে নয়, অন্য একজন সহিষ্ণু পুত্রের, কাজেই সেই সহিষ্ণু পুত্র হজরত এসমাইল। কারণ তিনি ও হজরত

এসহাক (আ) ভিন্ন হজরত এব্রাহিমের (আ) আর পুত্র ছিল না।

হজরত এব্রাহিমের প্রতি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সুসংবাদ দেওয়া হয়। একটি সহিষ্ণু পুত্রের—যিনি জবিহ ছিলেন। দ্বিতীয় পূণ্যবান নবি হওয়া—হজরত এসহাকের (আ)। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—জবিহ ভিন্ন ও হজরত এসহাক (আ) ভিন্ন ব্যক্তি। হজরত এসহাক (আ) ব্যতীত হজরত এব্রাহিমের (আ) হজরত এসমাইল (আ) ভিন্ন আর কোন পুত্র ছিল না, সুতরাং হজরত এসমাইলই (আ) জবিহ। এতদ্ভিন্ন হজরত এব্রাহিমকে যে স্থানে হজরত এসহাকের (আ) সুসংবাদ দিয়াছেন, তথায় খোদাতালা বলিতেছেন—

فبشرناه باسحاق نبيامن الصالحين *

"আমি এব্রাহিম (আ)কে এসহাকের পুণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছি।"

আর যে স্থানে কোরবানীর গল্প বলিতেছেন, তথায় বলিতেছেন—

فَبَشَّرۡنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيۡمٍ *

আমি এব্রাহিম (আ)কে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিয়াছি। পবিত্র কোরাণ শরিফের অন্য স্থানে হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—

قَالُوۡا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيۡمٍ *

"ফেরেস্তাগণ হজরত এব্‌রাহিমকে বলিয়াছিলেন আমরা আপনাকে এক বিজ্ঞ পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি।"

ইহাতে জানা যায়, হজরত এব্‌রাহিমের দুই পুত্রের সুসংবাদ দুই গুণের উল্লেখ করিয়া দিতেছেন। একজনকে حليم সহিষ্ণু, দ্বিতীয়কে عليم বিজ্ঞ গুণ দ্বারায় উল্লেখ করিতেছেন। হজরত এসহাককে (আ) عليم বিজ্ঞ গুণে উল্লেখ করিতেছেন,

জবিহকে সহিষ্ণু গুণে উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সে স্থলে তাঁহার নামের উল্লেখ না থাকিলেও তিনি যে عليم বিজ্ঞ গুণে অভিহিত, হজরত এসহাক (আ) হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যাইতেছে আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, হজরত এসহাক (আ) ভিন্ন হজরত এব্রাহিমের (আ) কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এসমাইলই (আ) ছিলেন। সুতরাং তাঁহারই উল্লেখ সহিষ্ণুতা গুণের জন্য হইয়াছে এবং তিনিই প্রকৃত জবিহ।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব আয়েতে খোদাতালা বলিতেছেন—আমি এসহাককে (আ) পূণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিই। তাঁহার নবি হওয়ার পূর্ব্বেই যদি তাঁহাকে জবেহ করার হুকুম হয়, তাহা হইলে ইহা সুসংবাদের বিপরীত কার্য্য হয়। যেহেতু বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে নবি হইতে পারে না। কোরবানীর আদেশ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে হইয়াছিল—সুতরাং নবি হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ

আদেশ হইয়াছে। ঐ আদেশ হজরত এসহাকের (আ) জন্য হইলে তাঁহার নবি হওয়া ঘটে না। যাহাকে নবি করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহাকে নবি করার পূর্ব্বে কেন জবেহ করিতে অনুমতি করিবেন? সুতরাং হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে কোরবানীর আদেশ হয় নাই।

পবিত্র কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় স্থানে খোদাতালা বলিতেছেন—

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ *

"আমি সুসংবাদ দিই সারাকে এসহাকের (আ) তৎপর ইয়াকুবের।" ইহাতে বোধ হইতেছে, হজরত এসহাকের (আ) ঔরসে এক পুত্র জন্মিবে যাঁহার নাম ইয়াকুব (আ) হইবে। এক্ষণে ইয়াকুবের (আ) জন্মের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক হজরত এসহাকের (আ) জবেহের আদেশ কিরূপে হইতে পারে? হজরত এসহাক (আ) জবেহ হইলে তাঁহার ঔরসে হজরত ইয়া-

কুব (আ) কিরূপে জন্মিতে পারেন? সুতরাং ঐ সুসংবাদের বিপরীত কার্য্য হয় বলিয়া হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে জবেহের আদেশ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, খোদাতালা হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধে পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন—

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا *

"তুমি এসমাইলকে স্মরণ কর, সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবান, এবং সে রসুল ও নবি ছিল।"

হজরত এসমাইল (আ) তাঁহার পিতা হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি জবেহের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতির সত্যতা তিনি কার্য্যকালেও দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই সত্য প্রতিশ্রুতির জন্য খোদাতালা পবিত্র কোরাণ-

শরিফে বলিয়াছেন—"সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবান।"

চতুর্থতঃ, খোদাতালা পবিত্র কোরাণশরিফে বলিয়াছেন, এবং এসমাইল ও এসহাক ও জাল-কেফ্ল্ সকলেই সহিষ্ণু এসমাইলকে (আ) "সহিষ্ণু" কেন বলেন—হজরত এসমাইল (আ) যে প্রকৃত জবিহ এবং সেই বিষম ভক্তি পরীক্ষায় (কোরবানীতে) তিনি যে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন, সেই জন্য এইরূপ বলা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

পবিত্র কাবার চাবি রক্ষক, হজরত সাবিও বলেন, —হজরত এসমাইল (আ) প্রকৃত জবিহ। কারণ তাঁহার পরিবর্ত্তে যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল তাহার শৃঙ্গ কাবা মন্দিরে রক্ষিত ছিল। তাহা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যাই-তেছে যে, এই পবিত্র কোরবানী মক্কাশরিফে হইয়া-ছিল। হজরত এসমাইল (আ) মক্কাশরিফে বাস করিতেন, সুতরাং তিনিই প্রকৃত জবিহ—

وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ *

যৎকালে আবদুল আজিজের পুত্র ওমর শাম প্রদেশে খলিফা (ভুপতি) ছিলেন, সেই সময়ে কাব পুত্র মহাম্মদ তাঁহার নিকট ছিলেন। একদা তিনি খলিফাকে এই পবিত্র কোরবানী সম্বন্ধে (হজরত এসমাইল (আ) হইয়াছিলেন কিনা) জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন, তাঁহারও অনুমান ঐরূপ। (তিনি ঐ বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করার জন্য) একটী ইহুদী পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পবিত্র এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহুদিগণের কি মত, তাঁহার নিকট হইতে জানার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি উপস্থিত হইলে খলিফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হজরত এব্রাহিম (আ) কোন্ পুত্রকে কোরবানী করিয়াছিলেন? তিনি বলেন, হজরত এসমাইলকেই (আ) কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল। হে খলিফা! আমি করুণাময় খোদা-

তালার শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, ইহুদিগণ ইহা বিশেষ রূপ অবগত থাকা সত্ত্বেও আরবগণের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হজরত এসহাককে (আ) জ়বিহ বলেন। কারণ হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষ। সুতরাং আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষের ঐরূপ যশঃকীর্ত্তন করিতে হৃদয়ে ব্যথা পায়, তাহাদের প্রতিপক্ষেরা আপন পূর্ব্ব পুরুষের সহিষ্ণুতা ও প্রভুভক্তি দেখাইয়া কাজেই তাহারা যশোকীর্ত্তন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ হজরত এব্রাহিমের (আ) উভয় পুত্র পবিত্র প্রভুভক্ত ছিলেন।

ইহুদিগণের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, হজরত এব্রাহিমের (আ) ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, হজরত এসমাইল (আ) এবং ৯৯ বৎসর বয়ক্রম কালে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হজরত এসহাক (অ) জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত পুস্তকে ইহাও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, খোদাতালা তাঁহার وحيد একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ সেই পুত্র ভিন্ন তাঁহার অন্য পুত্র তৎকালে ছিল না।)

কোরবানী করার আদেশ করেন। ঐ গ্রন্থে بکر শব্দও আছে। উহার অর্থ প্রথম পুত্র। তাহার পর অন্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করে নাই। ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, হজরত এসমাইলই (আ) প্রকৃত জবিহ। যদিও উক্ত গ্রন্থে দুই শব্দ আসিয়াছে وحید ও بکر একমাত্র ও প্রথম, যাহার পরে অন্য পুত্র জন্মে নাই, এই উভয় শব্দের অর্থ একই এবং হজরত এসমাইলই (আ) প্রথম পুত্র এবং যে সময় ঐ কোরবানীর আদেশ হইয়াছিল, তৎকালে হজরত এসহাকের (আ) জন্ম হয় নাই। সুতরাং তিনিই কেবলমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই ঐ উভয় শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। হজরত এসমাইল (আ) যে প্রথম ও জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং তিনিই প্রকৃত জবিহ। যে হেতু হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষ এবং হজরত এসহাক (আ) ইহুদিগণের পূর্ব্ব পুরুষ। ইহুদিগণের সহিত আরবগণের ধর্ম্মবিষয়ক শত্রুতা ও মত ভেদ থাকায় প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ

বশতঃ প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া আপন পূর্ব্ব পুরুষের যশোগান পরিকীর্ত্তিত করিবার জন্য নিজ ধর্ম্মপুস্তকের অযথা অর্থ করিয়া হজরত এসহাককে (আ) প্রকৃত জবিহ বলিয়া গিয়াছেন। তাহা-দের মতে এই পবিত্র কোরবানী শামদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে হজরত এসমাইল (আ) মক্কায় ছিলেন, একমাত্র হজরত এসহাকই (আ) শাম প্রদেশে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকটে ছিলেন। সেই জন্য وحيد একমাত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর হজরত এসহাকের (আ) পর হজরত এব্রাহিমের (আ) অন্য কোন পুত্র জন্মে নাই বলিয়া بكر শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ যাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান, তাহার এক পুত্র নিকটে ও অন্য পুত্র বিদেশে থাকিলে যে পুত্র নিকটে থাকে তাহাকে একমাত্র পুত্র বলা যাইতে পারে না। আর بكر শব্দও হজরত এসহাকের (আ) প্রতি আদৌ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ যদিচ

হজরত এসহাকের (আ) পর হজরত এব্‌রাহিমের অন্য পুত্র জন্মে নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রথম পুত্র নন্। بكر শব্দের অর্থ প্রথম পুত্র। যাঁহার পর অন্য পুত্র জন্মে নাই, সুতরাং উহা তাঁহার প্রতি প্রয়োগ না হইয়া হজরত এসমাইলের (আ) প্রতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে তিনিই তাঁহার প্রথম পুত্র এবং ঐ সময়ে দ্বিতীয় পুত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আর এই পবিত্র কোরবানী যে মক্কাতে হইয়াছিল—তাহাও সুনি-শ্চিত। তাহারই অনুকরণে এখনও ঐ পবিত্র স্থানে হাজীগণ কোরবানী করিয়া থাকেন। এবং যে স্থানে শয়তান বাধা দিতে আসায় হজরত এব্‌রাহিম (আ) ও হজরত এসমাইল (আ) তাহার প্রতি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহারই অনুকরণে হাজিগণ অদ্যাবধি ঐ স্থানে সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এবং হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল, তাহার শৃঙ্গ পবিত্র কাবা-

মন্দিরে রক্ষিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মক্কাতে এই যে পবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহুদিগণ কেবল সেই ذبيح শব্দ প্রয়োগ করার জন্য সত্যের অপলাপ করিয়া শাম প্রদেশে এই পবিত্র কোরবানী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ নাই, এবং তাহা হইলেও ذبيح শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না।

এই কোরবানীর আদেশ কেবল পরীক্ষার জন্য হইয়াছিল। খোদাতালা কাহারও রক্ত পিপাসু ছিলেন না। কেহ তাঁহার নিকট কোন অপরাধে অপরাধীও হন নাই। সুতরাং সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ঐরূপ নৃশংস কোরবানীর আদেশ হয় নাই। তিনি কেবল হজরত এব্রামের (আ) হৃদয়ের বল, তাঁহার প্রতি প্রেম, প্রভু ভক্তি, কর্ত্তব্য পালন, প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় কি না; তাঁহার স্নেহ, ধর্ম্ম ও অপত্য প্রেমের মুখে পুত্রের প্রতি স্নেহ

অতি সামান্য মনে করিয়া, অপত্যস্নেহ উপেক্ষা পূর্ব্বক আজ্ঞা পালন করতঃ প্রভুভক্তির ও প্রভু প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন কি না— তাহাই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় দুম্বা প্রেরণ করিয়া ছিলেন। পুত্রকে বধ করার মানসে ঐরূপ আদেশ করিলে কখনই তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জন্তু পাঠাইতেন না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐরূপ পরীক্ষা কিসে পূর্ণ-মাত্রায় হইতে পারে? যাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহার এক পুত্রের প্রতি যতদূর স্নেহ মমতা থাকে, কেবল জীবনের অবলম্বন একমাত্র পুত্র যাহার থাকে, সেই একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহ অধিক হইয়া থাকে ইহাই জনকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং একমাত্র পুত্রের প্রতি এরূপ আদেশ হইলে প্রেম ও ভক্তি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে। বিশেষ হজরত এব্রাহিমের (আ) সন্তান না থাকায় করুণাময় খোদাতালার সমীপে নানাপ্রকার আরাধনা ও প্রার্থনা করিয়া হজরত

এসমাইলকে (আ) ৮৬.বৎসর বয়ঃক্রম কালে পুত্র রূপে লাভ করিয়াছিলেন। যে বস্তুর চির-জীবন অভাব থাকে—বহু পরিশ্রম·ও বহু কষ্টে সেই জিনিসটী লাভ হইলে তাহার প্রতি যতদূর মায়া মমতা হয়, তাহা অন্যের প্রতি হইতে পারে না। হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধেও তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে অতি কষ্টলব্ধ—তাঁহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র হইতে পারে না। তাঁহার প্রতি মায়া মমতা ও স্নেহ যতদূর হইতে পারে ততদূর অন্যের প্রতি কিছুতেই হইতে পারে না। কাজেই তাঁহার প্রতি ঐরূপ আদেশ না হইলে পরীক্ষার সম্পূর্ণতা ঘটিতে পারে না। আর একটী পুত্রকে খোদা-তালার আদেশে তাঁহার পবিত্র নামে কোরবানী করিয়া নিজের জীবনের অবলম্বন অন্য একটী বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে দেখিয়া প্রাণ শীতল করা যায়। মনকে প্রবোধ দেওয়ার উপায় থাকে, সুতরাং সে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু

ঐরূপ জীবনের অবলম্বন মনকে তৃপ্ত করা, প্রবোধ দেওয়া ও অভাব পূরণের বস্তু না থাকিলে সেই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। সেই অবস্থাতেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে প্রেম ও প্রভু ভক্তির ওজন (তুলনা) করা যাইতে পারে বিধায় বহু কষ্ট ও যত্নপ্রসূত সেই একমাত্র সখের বস্তু, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের প্রতি অন্য পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ঐরূপ কঠোর আদেশ হইলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয়। সেই কারণে হজরত এসমাইলই (আ) প্রকৃত জবিহ তাহা প্রমাণ হইতেছে। কারণ তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। হজরত এব্রাহিমের (আ) সন্তান না হওয়ায় চির জীবন সন্তানের জন্য কায়মনো বাক্যে খোদাতালার সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই একমাত্র যথাসর্ব্বস্বকে দ্বিতীয় পুত্র হজরত এসহাকের (আ) জন্মের পূর্ব্বে কোরবানীর আদেশ হইয়াছিল।

এ বিষয় আর অধিক আলোচনা ও প্রমাণ-প্রয়োগ আবশ্যক বোধ করি না। কারণ ইহা আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের অঙ্গ নয়। হজরত এসহাককে (আ) জবিহ বলিলে আমাদের ধর্ম্মের কোন হানি নাই, সুতরাং এবিষয়ে অধিক যুক্তি প্রমাণ পরিপোষণে বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধে অধিকাংশের মত বলিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে উপরের লিখিত রূপ যুক্তি প্রমাণ থাকায় তাঁহাকেই প্রকৃত জবিহ অর্থাৎ তাঁহাকেই কোরবানী করা হইয়াছিল স্থির করিয়া এ গ্রন্থে তাঁহারই বিষয় লিখিত হইল।

সম্পূর্ণ।

পাঠকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্টে যে সকল কথার ব্যাখ্যা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, এবার সময়ের অল্পতা বশতঃ ঘটিয়া উঠিল না। তজ্জন্য পাঠকমহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। দয়াময়ের ইচ্ছায় উহা সত্বর প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থকার।

যিনি মান্য করে তাঁয়, তিনি স্বর্গবাসী।
কেনরে নরক ভয়, হবে তার আসি ॥
সর্ব্ব কষ্ট খুলে যায়, দুঃখ দূর হয়।
বড়পীর নাম যিনি, সর্ব্বক্ষণ লয় ॥
নিজে তিনি ধনি, ধন তাহার প্রচুর।
কেন রে মুরিদ আর, দুঃখে রবে পুর ॥
সর্ব্ব সাধুপদ তায়, লয় গ্রীবা পরে।
কেন না নবির পদ, তিনি শিরে ধরে ॥
গোর মধ্যে দেব তিনি কৈল পরাজয়।
তারি গুণে দেবে পেল লোক পরিচয় ॥
উভয় কালেতে কর্ব্বে, মুরিদ রক্ষণ।
একারণে ভবনেতে, তাঁর আগমন ॥
বাঞ্ছারূপী চাবি তিনি উভয় কালের।
আহা রে তাহার গুণে রক্ষা মুরিদের ॥
মোর হাত ধর আমি মুরিদ তোমার।
আর কত বিচ্ছেদের উঠাইব ভার ॥
মরা মন তাজা কর, ধর্ম্মের জীবন।
দেখহ মুরিদ তব, হয়েছে দাহন ॥
মৃত্যুপরে রে লুথফ রবে তুষ্টময়।
শেষ শ্বাসে নাম যদি বড়পীর হয় ॥

বড় পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায় ॥

সম্পূর্ণ।

নাই। মন বড়ই উতলা থাকিল এবং বহু দুঃখ অনুভব হইতে লাগিল। উপায় নাই, কথাটীত বলিবার নহে। ওদিকে কাজি সাহেবও হঠাৎ জামাতা হারাইয়া, বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। তথাকার অনেকেরই অনেক রূপ ধারণা হইল বটে, কিন্তু কোনটাই কিছুই হইল না। তৎপরে কাজি সাহেব সমস্ত ঘটনা পীরসাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, বড় পীরসাহেব সেই পত্রখানা মৌলানা সাহেবকে দেখাইয়া বলিলেন যে, তোমার সেটা স্বপ্ন নয়, প্রকৃত ঘটনা। অতএব তুমি সেখানে যাও, এবং কয়েকদিন তথায় থাকিয়া, আপন পরিবার সঙ্গে লইয়া এখানে আইস। মৌলানা সাহেবও তাহাই করিল। এবং আজীবন পীরসাহেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গের অধিবাসী হইল।

সত্য বটে যাঁরে গুণ দিয়াছে খোদায়।
যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি করেন সদায়॥

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

দেওয়ান লুতফে বড় পীরসাহেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম।

বড় পীর প্রেমে বদ্ধ, মনরে আমার।
একারণে হচ্ছে ভাগ্য চন্দ্রের আকার॥
মোরে না দেখাও কেহ প্রলয়ের ভয়।
বড় পীর দাস হই জানহ নিশ্চয়॥

সকল মোসাফের স্থান পাইয়া থাকে, আপনিও সেই স্থানে যান, নিশ্চয় স্থান পাইবেন। ইহা শুনিয়া মৌলানা সেইখানে গিয়া কাজি সাহেবকে ছালাম করিয়া, আবেদন করিল, কাজি সাহেব! এই হতভাগা বড় পীরসাহেবের মুরিদ। সাহেব ইহা শুনিবামাত্রই শত সহস্রবার মৌলানা সাহেবকে ছালাম করিয়া সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, হুজুর! আমার এখানে যত ধন জন ঘর বাড়ী আছে, সমস্তই আপনার জানিবেন, আমি মাত্র আপনার গোলাম স্বরূপ আছি, আপনি যখন যাহা হুকুম করিবেন, তাহাই মান্য করিব। এবং মনে প্রাণে খেদমত করিতে থাকিব।

মৌলানা সালেহ সাহেব এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেখানেই দুই বৎসর শিক্ষকতা করিল। পরে যখন কাজি সাহেব মৌলানা সাহেবকে সর্ব্বগুণে গুণী দেখিলেন, তখন পরম ভক্তিসহ নিজের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। মৌলানা সাহেবও সেই পরমা সুন্দরী কুলীনবালা বিবি পাইয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইল। বহুসুখে আরও সাত বৎসর তথায় বাস করিল। এই সময়ের মধ্যে তাহার তিনটী পুত্র সন্তান হইল। এবং তথাকার সমস্ত অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ঘটিল। ঠিক এই সময়ে ওয়াজের সভা ভঙ্গ হইল। সুতরাং সকলেই আপন আপন বাড়ীতে চলিল। পীরসাহেবও মৌলানার মাথা হইতে আস্তিন তুলিয়া লইলেন। মৌলানার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মৌলানা চেতন পাইয়া এটা অলীক স্বপ্ন ভাবিয়া পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁহার দরগায় পৌছিল। কিন্তু পরিবারের কথা মন হইতে যায়

চতুর্থ কেরামতের কথা।

মোম কাবাতে গৌসিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন বড় পীরসাহেব মেম্বরে আরোহণ করিয়া উপদেশ (ওয়াজ) দিতে ছিলেন, সেই সময় সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল। আর বড় বড় মৌলবী মৌলানা সাহেবগণও অনেক ছিল, এবং সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছায় উপদেশ লইতে ছিল। তন্মধ্যে সালেহ নামীয় মৌলানা সাহেবের দৈবাৎ উদরে ভয়ানক বেদনা হইয়া মলবেগ হয়। কিন্তু সে সময় সেখান হইতে উঠিবার শক্তি ছিল না। আবার পূর্ব্ব হইতেই বড়পীর সাহেবের নিষেধ ছিল, ওয়াজের সময় কেহ উঠিও না। সুতরাং সে সময় তাহার অবর্ণনীয় কষ্ট উপস্থিত হয়। অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া বড় পীরসাহেবের নিকট নালিশ করিলেন, পীরসাহেব শুনিয়া তাহার শিরে নিজের জামার আস্তেন ফেলিয়া দিলেন। মস্তকে আস্তিন পড়ামাত্রই সে নিদ্রা গেল। স্বপ্নে দেখিল, সে কোন একটী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আছে। অমনি তাড়াতাড়ি মল মূত্র ত্যাগ করিয়া, নদীর জলে ওজু তজু করিয়া মনে ভাবিল, এমন উৎকৃষ্ট পানি পাইয়াও যদি গোছল না করি, তবে মনে বড় খেদ থাকিবে। অতএব জামা ও চাবি নিকটস্থ বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া দিয়া, গোছল করিয়া জামা পরিধান করিল। কিন্তু চাবিটী লইতে মনে হইল না। তৎপর কিছু দূর অগ্রসর হইবামাত্র একটী উত্তম সহর দেখিতে পাইল। তাহা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য হইয়া তথাকার অধিবাসীদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই! এ সহরে কি মোসাফের লোকের স্থান পায়? সকলেই জবাব দিল, হাঁ, কাজি সাহেবের বাড়ীতেই

উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু সেই ফকির সাহেবের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঠক! সন্ধান কি প্রকারে পাইবেন? তিনি যে, নিজেই বড় পীরসাহেব ছিলেন।

ভক্তিছন্দে সেবা যেবা করে বড়পীর।
উভয় কালেতে তিনি রবে জেন স্থির॥

তেসরা কেরামতের বয়ান।

বহুতর গ্রন্থে কথিত আছে, যখন পয়গম্বর সাহেবের সমস্ত পুত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন কাফেরেরা ঘৃণা করিয়া বলিতে লাগিল, উনি আটখুড়া। শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। এসময় জিবরাইল আলায় হেচ্ছালম, নাজেল হইয়া বলিলেন, হে পয়গম্বর সাহেব! (খোদাতালার দয়া বারি আপনার উপর বর্ষণ হউক) খোদাতালা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, পুত্র পরিবর্ত্তে আপনাকে হাউজ কৌশর দিলাম। আর যদি পুত্রের জন্য একান্তই দুঃখিত থাকেন, তবে এই পুত্রটী লউন। ইহার নাম আবদুল্লা কাদের, ইনি বড়পীর হইবেন। ইহাকে লোকে গৌসে আজম বলিবে। ইনি হোসেনের বংশে, এবং আবিসালেহের পুত্র হইবেন। ইহার দ্বারা আপনার দিন, (ধর্ম্ম) তাজা হইবে। ইহার গুণাবলী অবর্ণনীয়, ইহার সম্মুখে দেবেরা নত, খোদার কলম ইচ্ছাধীন। ইহা শুনিয়া পয়গম্বর সাহেব বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং পুত্রের শোক ভুলিয়া গেলেন।

ওহে মিঞা যার পুত্র হেন গুণময়।
কেন সে হবে না তুষ্ট কালেতে উভয়॥

দোসরা কেরামত।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে একটী সওদাগর ছিল। তিনি প্রতি বৎসরই বড় পীরসাহেবের ফতেহা করিতেন। দৈবাৎ সেই সহরে ভীষণ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া, ছোট বড় অনেক লোক মরিতে থাকিল। ইতিমধ্যে ফতেহার দিন উপস্থিত। সওদাগর ফতেহার জন্যে যথেষ্ট আয়োজন করিলেন। কিন্তু যে দিন ফতেহা হইবে, সেই রাত্রে তাঁহার ভয়ানক ওলাউঠা হয়। তিনি মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, পত্নীকে (বিবিকে) অছিয়ত করিলেন, প্রিয়ে! আমার মৃত্যু হইলে, আমার লাস ঘরে লুকাইয়া রাখিবে। সাবধান, যেন কেহই জানিতে না পারে। ওদিকে ফতেহার যত সামগ্রী আছে, তাহা সন্তুষ্টমনে প্রাতে সকলকে সেবন করাইবে। দেখিও, যেন কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহ না হয়, সকলেই যেন প্রফুল্ল মনে আহার করে। যদি কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে বলিবে, তিনি অতি আবশ্যকীয় কার্য্যে কোন স্থানে গিয়াছেন। আহারাদি শেষ হইলে, আমার লাস বাহির করিয়া সত্য কথা বলিবে। স্বামীর মৃত্যু হইলে বিবি তাহাই করিল। সকলেই আনন্দিত মনে আহার করিল। কিন্তু একটী ফকির শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই আহার করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, আমি গৃহস্বামীকে রাখিয়া কখনও খাই না, আজও খাইব না। পরিশেষে সত্য ঘটনা প্রকাশ করা হইলে, তিনি লাস দেখিতে চাহিলেন। লাস তাহার সম্মুখে আনিত হইল, তিনি উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিঞা সওদাগর! বড়পীরের হুকুম তুমি উঠিয়া আহার কর। এই কথা বলামাত্রই সওদাগর

সেটা সকলের অপেক্ষা সবল ও মাংসল। দারোগা কসাইকে বলিল, এটা দাও, ব্যাঘ্রকে দিব। কসাই আপত্তি করিয়া বলিল, মহাশয়! এটা বড়পীরের ফতেহার জন্য রাখিয়াছি, এটা দিতে পারি না, অন্য একটা লউন। ইহা বলিয়া অনেক টাকা ঘুস দিতে চাহিল, কিন্তু দারোগা কিছুতেই ছাড়িল না, বলপূর্ব্বক ঐ পাঁঠা লইয়া ব্যাঘ্রকে দিল। কিন্তু ব্যাঘ্রটার এত ক্ষুধা সত্ত্বেও সেই পাঁঠা দর্শনে ভয় পাইয়া, পশ্চাৎ ফিরিল। হিন্দুরা ইহা দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, ব্যাঘ্রেরাও বড়পীরের মান্য করে। তখন রাজা, বলিলেন, পীরটীর কিছু নয়। পাঁঠাটাই অমর, এজন্য ব্যাঘ্র খায় নাই। তবে যদি বড় পীরসাহেবের ফতেহার দিন ওটা জবাই করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই বড় পীরসাহেবের গুণ আছে মানিতে হইবে। দুই সপ্তাহ পরে পীরসাহেবের ফতেহার দিন ১১ই রবিওলসানি আসিল। তখন সমস্ত হিন্দুরা মহারাজার সহিত তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল। ওদিকে কসাই বেটা অন্যান্য পশুর সহিত সেই পাঁঠা জবাই করিল, কোন উপদ্রবই ঘটিল না। তখন সকলেই বড়পীরের গুণ মানিল। এমন কি, স্বয়ং মহারাজা তাহার সমস্ত হিন্দু প্রজাদিগকে আদেশ করিলেন, সাবধান! বড়পীরের ফতেহা করিতে ভুলিও না।

খোদাতালা শক্তি যারে দিয়াছে অপার।
জীবন মরণ তার একই প্রকার॥

বড়পীর কর দয়া, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

মৌলুদসরিফ বাহারিয়া নামক গ্রন্থের শেষ ভাগে বড় পীরসাহেবের যে সকল কেরামত উর্দ্দু ভাষায় রচিত আছে, তাহার সারমর্ম্ম বাঙ্গালায় দেওয়া গেল।

পীরসাহেবের পহেলা কেরামত।

হিন্দুস্থানের মধ্যে পঞ্জাব নাম্নী একটী দেশ আছে। সে দেশটী যেমনই বৃহৎ, তেমনই সুখের স্থান। সুসভ্য অনেক লোকের তথায় বাস। নবাব, রাজা, মহারাজার সংখ্যা নাই। নদনদীও অনেক প্রবাহিত, সেই স্থানের একটী হিন্দু রাজা যেমন সুশ্রী, তেমনই প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার মহিষীও রূপে গুণে অতুলনীয়। উভয়ে উভয়ের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, একজনকে না দেখিলে অপরে থাকিতে পারে না। কিছুদিন যায়, দৈবাৎ মহিষীর ভয়ানক পীড়া হইল। অনেক শুশ্রূষা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অকালে মহিষীর প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল। তখন রাজার আর দুঃখের সীমা থাকিল না। রাজা মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া আদেশ দিলেন, রাজ্যের প্রজা মাত্রই রাণীর জন্য শোক প্রকাশ করিবে, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত কেহ কোন জীব বধ করিতে পারিবে না। হিন্দু মুসলমান সকলের উপরেই একই হুকুম জারি হইল। উভয় লোকেই তাঁহার হুকুম মান্য করিল। মহারাজার একটা পোষা ব্যাঘ্র ছিল, সেটা সাতদিন না খাইয়া মরমর হইল। কারণ সেই ব্যাঘ্র মাংস ছাড়া কিছুই খায় না। রাজা নিরুপায় হইয়া, পণ্ডিতদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, হাতি রক্ষা হেতু হরিণ বধ করা যায়। অতএব ব্যাঘ্রকে একটা পাঁঠা দাও। দারোগা কসায়ের বাড়ীতে একটা পাঁঠা পাইল।

সকলেই পদধুলি, নিতেছে তোমার।
তব দ্বার ভূমি মান্য, সুর্ম্মার প্রকার॥
তব গুণে সর্ব্বজন, পেয়েছে রক্ষণ।
মোর জন্য হয় গৌণ, কিসের কারণ॥
নিজ প্রাণ ধরে দিনু, সেবাতে তোমার।
করহ মঞ্জুর, এই—ক্ষুদ্র উপহার॥

বড় পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

গ্রন্থকারের উক্তি।

নবির তফিল হতে ওহে দয়াময়।
লেখকেরে রেখ তুষ্ট কালেতে উভয়॥
আর প্রভু ভাল কর লেখকের কুল।
উভয় কালেতে তারা থাকে সুকুশল॥
মূদ্রন্‌কারি মফিজউদ্দি অতি বিচক্ষণ।
তাহাকে প্রদান সুখ মনের মতন॥
তাঁহার আত্মীয়ে তুষ্ট রাখহ সদায়।
এ দুঃখী তোমার দ্বারে এই ভিক্ষা চায়॥

হইতে রক্ষা করেন, তবে আমিও ফেরেস্তাদের অপরাধ মার্জ্জনা করি। খোদার তরফ হইতে হুকুম আসিল, হে প্রিয়! আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। তুমি ফেরেস্তাদিগকে ক্ষমা কর। তখন পীরসাহেব তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল।

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

মোনাজাত বা প্রার্থনা।

হাত ধর রক্ষা কর, ওহে! মম পীর।
রিপুর দৌরাত্ম হতে করহ সুস্থির॥
পদে বল নাই যাতে করিব গমন।
রস বটে একেবারে, করেছ বন্ধন॥
মনরিপু চায়, আর করিতে সেবন।
কখন না দেখা পাই, নিজের রক্ষণ॥
কত কান্না কাটী কৈনু, দিবস রজনী।
তবুও রক্ষার পথ, হলনা দর্শনী॥
এই বলে বহু ভয়, হয়েছে আমার।
সকলি করিনু ব্যাখ্যা, নিকটে তোমার॥
যেই শ্বাসে নাম, তব লই মন ভরে।
তখনই কষ্ট দূর হয় একেবারে॥
মনকষ্ট সকলের জানহ অশেষ।
কেন হে! বর্ণন আর করিব বিশেষ॥
আশা হতে তোমা দ্বারে, করেছি তুলন।
রিপু হতে মনপাখি, করহ রক্ষণ॥

না আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে, সে পর্য্যন্ত আমি তোমাদের হাত ছাড়িব না।

বড় পীরের এই কথা শুনিয়া মনকের নকীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, উত্তর দিতে বুদ্ধি জোগাইল না। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিবেদন করিল, হুজুর, আমরা দুজনে ত একথা বলি নাই? সমস্ত ফেরেস্তাই এই কথা বলিয়াছিল, এখন আপনার প্রশ্নের জবাব সকলের পক্ষ হইতে চাই। আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন। আমরা সমস্ত ফেরেস্তার নিকট হইতে জবাব আনিয়া আপনাকে বলিব। পীর সাহেব বলিলেন, তোমরা যদি ফিরিয়া আর না আইস, তবে আমি কি করিব? যাহা হউক তোমাদের একটীকে ছাড়িয়া দিই, সে যাইয়া সমস্ত ফেরেস্তার নিকট হইতে আমার প্রশ্নের জবাব আনুক। ফলে তাহাই হইল। একটী ফেরেস্তাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে স্বর্গে গিয়া সকল ফেরেস্তার নিকটে পীরের প্রশ্ন প্রকাশ করিল। শুনিয়া ফেরেস্তাগণ প্রমাদ গণিল। সেই সময় খোদাতালার তরফ হইতে হুকুম আসিল, হে ফেরেস্তাগণ! তোমরা আমার প্রিয় গৌছল আজমের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেন না, তিনি যে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ক্ষমা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তোমাদের খালাস হইবে না। অনন্তর সমস্ত ফেরেস্তা বড় পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল; এবং স্বয়ং খোদাতালার তরফ হইতে ক্ষমা করিবার জন্য সুপারিশ ইঙ্গিত হইল। তখন পীরসাহেবও খোদাতালার দরগায় আরজ করিলেন, হে প্রভু! যদি আপনি নিজের দয়া দান গুণে আমার সমস্ত মুরিদকে ক্ষমা করেন, এবং মনকের নকীরের ছওয়াল

আছে। তোমরা সেই প্রশ্নের জবাব দিলে তোমাদের প্রশ্নের জবাব পাইবে। তাহারা করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে বলুন, আপনার প্রশ্ন কি? আমি বলিলাম, শুন, যখন সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালা আদম আলায় হেছলামকে সৃজন করিয়া ভূমে তাহাদের নিবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন, তখন তিনি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আমি ভূমে অধিবাসী সৃজন করিব। তোমরা ফেরেস্তাগণ খোদাতালার এই আদেশ শুনিবামাত্র অগৌণে বলিয়া ফেলিলে, হে প্রভু! ভূমে আবার কি সৃজন করিবেন? সৃষ্ট জীবগণ যে তথায় বিবাদ করিবে, রক্তপাত করিবে। এখন বুঝ, এই কথায়, তোমাদের নারাজী ও গৌরব এবং অহঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছিল কি না? প্রথমতঃ তোমারা খোদাতালাকে পরামর্শ অন্বেষণকারী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। ফলে কিন্তু তিনি গুণী ও নিরাপদ; কাহারও নিকট তাঁহাকে পরামর্শ লইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত জনগণকেই ঐরূপ বিবাদকারী, রক্তপায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। কিন্তু ইহা জানিলে না যে, তাহাদের মধ্যে এমন লোকও অনেক হইবে, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। তয়, তোমরা অতি বড়দরের একটী গৌরব করিয়া বসিলে। কেননা, সেই সর্ব্বজ্ঞানী খোদাতালার জ্ঞান হইতে তোমাদের জ্ঞান অধিক বিবেচনা করিয়াছিলে। যখন সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালা, তোমাদিগকে এই প্রবচনার তাজিয়ানা মারিলেন, (যাহা আমি জানি, তাহা তোমরা জান না) তখন তোমরা নিস্তব্ধ হইলে। এখন আমি বলিতেছি, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহা হইলেই আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। যে পর্য্যন্ত

ওহে ভাই যেই গুণ, শুনিনু পীরের।
কেন না করিব মান্য তাহার খাতের॥
বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

মনকের নকীরকে বড় পীর সাহেব প্রশ্ন করেন।

আত বাহুল আওমাদ পুস্তকে বর্ণিত আছে, যখন বড় পীর সাহেব (তাহার উপর খোদাতালা সদয় রন) নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, তখন একটী প্রধান সাধু স্বপ্নে বড়পীর সাহেবের দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুণময় পীরসাহেব! আপনি মনকের নকীরের প্রশ্ন হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন, ভাই! ওরূপ জিজ্ঞাসা করিও না, বরং জিজ্ঞাসা কর, মনকের নকির আমার হস্ত হইতে, কিরূপে অব্যাহতি পাইল। পরে বলিলেন, হে সাধু! বলিতেছি শুন। যখন সেই দুইটী ফেরেস্তা আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার রক্ষক কে? তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা কি মুসলমান? তাহারা বলিল, হাঁ, আমরা মুসলমান। তখন আমি বলিলাম, মুসলমান লোক, প্রথমে ছালাম করে, পরে মোছাফা করে, তার পরে তাহারা কথোপকথন করে। কিন্তু বিনা ছালাম ও বিনা মোছা-ফায় কথোপকথন করা কোথাকার প্রথা? তাহারা এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল, পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া ছালাম করিয়া, আমার হাত ধরিল। আমিও তাহাদের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলাম, মনকের নকির! তোমাদের নিকট আমার একটী প্রশ্ন

পীরসাহেব মরিয়া গেলে পর মুরিদ করেন, তাহার বিবরণ।

কথিত আছে যে, দামস্কের অধিবাসী একটী সওদাগর বড় পীরসাহেবের পরম ভক্ত ছিল; পূর্ব্ব হইতে তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, পীরসাহেবের পাক জোনাবে হাজির হইয়া তাঁহার মুরিদ হইব। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সুতরাং এইরূপেই চল্লিশ বৎসর অতীত হইল। পরে সওদাগর নিজের সমস্ত কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বোগ্দাদ সরিফে আসিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া শুনিতে পাইল, পীরসাহেব নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। সওদাগর এই সংবাদ শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিল। পরে পীর সাহেবের রোয়াজাতে যাইয়া পীর সাহেবের গোরের পাদ দেশে পড়িয়া চিৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। তাহার সকরুণ ক্রন্দন শুনিয়া পীরসাহেব স্বর্গীয় কায়া সহ সেই দণ্ডেই মাজার সরিফ হইতে বাহিরে আসিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, সওদাগর! তোমার হস্ত আমার হস্তে দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। তিনি সওদাগরকে মুরিদ করিয়া ফকিরী ধন দান করিলেন। তৎপরে আরও তিনশত লোক যাহারা ঐ সওদাগরের সঙ্গে আসিয়া ছিল, তাহাদ্দিগকে মুরিদ করিয়া, ফকিরী পরম ধন দান করিলেন। এই প্রকারে তাহারা সকলেই গুণময় পার হইয়া গেল।

পদ্য

আশা করি যেই আসে দ্বারেতে তোমার।
অবশ্যই কর দয়া উপরে তাহার॥

পদ্য।

স্বর্গ হতে মান্য হয়, সেলাম তোমায়।
খোদাতালার প্রিয় তুমি, আছহ সদায়॥
গুপ্ত ধন বিদ্যা গুণ, কামেল ফকির।
ধর্ম্মের রক্ষক আর তনয় আলীর॥
যাহা বল তাহা খোদা করেন স্বীকার।
তুমি রক্ষা কৈলে ভয় প্রলয়েতে কার॥
চন্দ্র সূর্য্য হতে গুণ দেখি যে তোমার।
সুকঠিন বিদ্যাগুণ করেছ প্রচার॥
স্বর্গবাসী মান্য করে তুমি ভুমি পরে।
সাধুর সম্রাট হয়ে নবিবংশ ধরে॥
স্বর্গবাসী প্রার্থী আর দর্শনে তোমার।
কেননা তোমার কায়া, দয়ার আধার॥
বাম হতে দক্ষিণেতে, আনিব প্রলয়।
তোমার মুরিদ লিপি, দেবে পাই ভয়॥
খোদা সম তব মান্য, আছে প্রকাশিত।
কেননা অসীম মান্য, দেখি যে নিশ্চিত॥
ওহে প্রভু দয়া কর, জন্য বড় পীর।
উভয় কালেতে যেন থাকি গুণে স্থির॥
দয়া করি নিজে রক্ষা করিবে যাঁহায়।
চন্দ্র সূর্য্য জন্য চিন্তা তাহার কোথায়॥
খোদা দোস্ত বলে হয়, তোমার লকব।
দোজাহানে আজ্ঞা তব চলিবেক সব॥

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

সাহেবের নিকট কিছু বলিতে পারি? তবে তোমার জন্য আমার পীরসাহেবকে ডাকিতে পারি। ইহা বলিয়াই নিজের পীরসাহেবকে ডাকিলেন। অমনি গুণময় পীর সুল-তান মুল মোসায়েক হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (তাহার মন খোদাতালা পাক করুন) সাহেবের আত্মা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার কি শক্তি যে বড় পীর সাহেবের নিকট কিছু বলি? পরে জনাব পয়গম্বর সাহেবের (তাহার উপর খোদাতালা দয়া বারিবর্ষণ করুন) আত্মা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বৎসগণ! আবদুল কাদের নিশ্চয়ই হোসেনের প্রিয়া ও ফতেমার দোলারা। আমি তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিব না; তবে ফতেমাকে ডাকাই। ফতেমার আত্মা উপস্থিত হইলে, দয়াময় নবিসাহেব মাখদুম বান্দা নোয়াজ সম্বন্ধে সুপারিশ করিলেন। হজরত ফতেমা রাজি আল্লা আন্‌হা বড় পীরসাহেবকে ডাকিলেন। তাঁহার আত্মা উপস্থিত হইলে, হজরত ফতেমা রাজি আল্লা আন্‌হা বলিলেন, আবদুল কাদের! তুমি বান্দা নোয়াজকে ক্ষমা কর। পীরসাহেব বড় জোরে আরজ করিলেন, নানা সাহেব! এই ঘটনা কি আমার নিজের ইচ্ছায় হইয়াছে! যাহা হউক হুজুরের আদেশ আমি শত সহস্রবার মান্য করি। তৎপর বড় পীরসাহেব পীর মাখদুম বান্দা নোয়া-জের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, ভাই হে! তোমার পীর তোমাকে যে সকল ফকিরী বস্তু দিয়াছেন, তাহা তোমারই থাকুক, তদ্ভিন্ন তাহার দ্বিগুণ আমা হইতে গ্রহণ কর। এই কথা বলা মাত্রেই পীর মাখদুম সাহেবের ফকিরী তিন গুণ বৃদ্ধি পাইল।

—

বড়পীর সাহেবের সঙ্গে কেহ বিয়াদবী করিয়া শাস্তি পায়,
তাহার বিবরণ।

সরিয়তের ও মারফতের বিচক্ষণ পীর সৈয়দ সাহ-মোজাহার আলি চোস্তী মাণিকপুরী সাহেব (তাহার উপরে খোদা সদয় রন) বড়পীর সাহেবের বংশধর এবং মাননীয় পীর মাখদুম হাস্মুল হক সাহেবের পুত্র (খোদার প্রিয়)। তাহার জবানী শুনা গিয়াছে, মাননীয় পীর, বান্দা নোয়াজ, ঘিছু দারাজ সাহেব (খোদাতালা তাহার দেল পাক করুন) এখন হায়দারাবাদের অন্তর্গত গুলবরগা সহরে তাহার রৌসন রোওজা, সরিফ আছে, তিনি জীবিতকালে একদিন নিজের দরগায় বসিয়া ওয়াজ করিতেছিলেন। সেই সময় সমস্ত মুরিদ ও শ্রোতাগণ উপস্থিত ছিলেন। একজন মোসাফের সেই সভায় হাজির হইয়া, কথায় কথায় বড়পীর সাহেবের গুণাগুণ বর্ণন করিতে থাকে। হজরত মাখদুম বান্দা নোয়াজ সাহেব শুনিয়া বলিলেন, বড়পীর সাহেব তাঁহার নিজের সময় সর্ব্বপ্রধান পীর ছিলেন সত্য, কিন্তু এখন আমিই সকলের প্রধান হইয়াছি। যেমন এই কথাটী উচ্চারিত হইল, অম্নি তাহার আলোকিত মনে ভয়ানক কালিমা পড়িয়া গেল। তখন বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রতি-কারের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্তর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া পীর দিল্লীর সম্রাট হজরত মাখদুম, নসিরুদ্দিন, রৌসন চেরাগকে (খোদাতালার তাহার মন পাক করেন) ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, আমি কি বড়পীর

সকলই আল্লা ছাড়া আর কাহারও নিকট করিও না, নিজের সমস্ত কাজই খোদাতালার উপর অর্পণ করিও। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, তৎসমস্তই তাঁহার নিকট জানাইও। আর জানিও, খোদাতালা একেশ্বর, কোনওকালে তাহার সরিক ছিল না, এবং কোনওকালে তাঁহার সরিক হইবে না। এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই দিন গত হইল। ওদিকে শনিবারের রাত্রে এসার নমাজের ওক্ত হইল। এই সময় পীরসাহেবের প্রাণপাখী অস্থায়ী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া স্বর্গধামে আরোহণ পূর্ব্বক খোদার সদনে মহা-সুখে মত্ত হইলেন। এদিকে সমস্ত পারস্যদেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। শুনা যায়, বড়পীর সাহেব, বিশ্বজগতে যেরূপ অধিকারী পাইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরেও তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কারণ দেখা গেল, যদি কোনও দরবেশ বোগদাদ সরিকে যায়, আর খোদার প্রিয় বড় পীরসাহেবের পাক মাজার জিয়ারত না করে, তবে সেই দণ্ডেই তাহার ফকিরীর সকল গুণ বিনাশ হয়।

ঈশ প্রেম অস্ত্রে যার নাশিছে জীবন।
ঘণ্টা প্রতি আছে তার জীবন যৌবন॥
বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

মাস অতিশয় কুৎসিত রূপে হাজির হইয়া আরজ করিল, হে পীরসাহেব! সন্তুষ্ট থাকুন। আমি সাবানের মাস, আপনাকে খবর দিতেছি, যে এই মাস মধ্যে বোদ্দাদের অনেক জীব বিনষ্ট হইবে। আর আরবে শস্য দুর্মূল্য হইবে, এবং খোরাসানে যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত ইত্যাদি হইবে। ফলে তাহাই হইয়াছিল। পরে যখন পবিত্র রমজান সরিফের মাস আগত হইল, তখন বড় পীরসাহেব কিছু কাতর ছিলেন। সেই চান্দের সোমবার দিন অনেক অনেক সাধুগণ বড় পীর সাহেবের জোনাবে হাজির ছিল। অকস্মাৎ সুশ্রী এবং সুসভ্য এক ব্যক্তি বড়পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, পীর সাহেব! সন্তুষ্ট থাকুন। আমি রমজানের মাস, আপনার নিকট বিদায় লইতে ও আপনাকে বিদায় করিতে আসিয়াছি। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আর দর্শন পাইব না। এই বলিয়া সেই মাস চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে বৎসরও কাটিয়া গেল। পাঁচশত একষট্টী হিজিরী সন আসিলে, পীরসাহেব অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, এবং রবিয়ল আউয়ল মাসের শেষ হইতে রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ক্রমে রবিয়সসানি মাসে জুম্মার দিন আসিলে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ে অনেক সাধু ও দরবেশ এবং বিচক্ষণ পুত্রগণ চতুষ্পার্শ্বে নক্ষত্রের ন্যায় বসিয়া ছিলেন। পীরসাহেবের তনয়, পীর আবদুল ওয়াহাব সাহেব (তাহার উপরে খোদাতালা সদয় হন) উচ্ছিয়ত চাহিলেন, ও বলিলেন, বাবাজান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, এ জীবনে সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, আশা, নিরাশা,

পাইলেন। তখন মুজাফরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। এদিকে অল্প কাল মধ্যেই নবাবের সমস্ত ধন জন বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এবং তিনি নিজে ভিখারীর বেশে বাড়ী বাড়ী 'হে বড় পীরসাহেব! হে বড় পীরসাহেব!' বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেবের স্বর্গারোহণের কথা।

বড় পীরসাহেবের তনয় সৈয়দ পীর সায়েফ উদ্দিন আবদুল ওয়াহাব (খোদাতালা তাঁহার মন পাক করুন) বলিতেছেন, পাঠকগণ! বৎসরের প্রতি মাসই পূর্ব্বাহ্ণে মানবরূপ ধরিয়া বড়পীর সাহেবের পাক জোনাবে হাজির হইত এবং সেই মাসে পাপ পুণ্য বা ভাল মন্দ যাহা কিছু হইবার হইত, তৎসমস্তই আরজ করিয়া যাইত, আর যে মাসে দুঃখ হইবার কথা থাকিত, সেই মাসে অত্যন্ত কুৎসিত রূপ ধরিয়া পীরসাহেবের পাক জোনাবে হাজির হইত। হিজরি পাঁচশত যাট সনে রজবের মাস এক অতি সুন্দর মানব আকার ধারণ করিয়া পীর সাহেবের জোনাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় আরও অনেক বড় বড় পীরগণ বড় পীরসাহেবের খেদমতে হাজির ছিলেন। ঐ রজব মাস আরজ করিল, হে পীরসাহেব! আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। আমি রজবের মাস, আপনাকে সুখের খবর দিতেছি। এই মাস মধ্যে সমস্ত মঙ্গল ভিন্ন কিছুই অমঙ্গল হইবে না। ফলেও তাহাই হইল। পর

করিয়া বড় পীরের এক জোড়া জামা প্রাপ্ত হন। সেই জামা জোড়া লইয়া, তিনি হিন্দুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন।

বড়পীর কর দয়া, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেব পরলোক গমন করার ৬০০ শত বৎসর পরে একটী কেরামত প্রকাশ করেন, তাহার বিবরণ।

যখন ইরানের সম্রাট নাদেরসাহ দিল্লি লুঠিতে আসেন, তখন সৈয়দসাহ মুজাফর সাহেব দিল্লিতে অবস্থান করিতেন। তাঁহার নিকট বড়পীর সাহেবের একটী জামা ও এক জোড়া পাদুকা ছিল। উহা চুরি যাইতে পারে, বিবেচনায় বাক্স বন্ধ করিয়া নবাব জাকরীয়া খাঁ সাহেবের নিকটে আমানত রাখা হয়। যখন সহরে শান্তি স্থাপিত হইল, তখন তিনি নবাবের নিকট হইতে ঐ বস্তু চাহিয়া পাঠাইলেন। নবাবসাহেবও বাক্সটী ফেরত দিলেন। সৈয়দ সা মুজাফর বাক্স খুলিয়া দেখেন, পীরসাহেবের জামা ও পাদুকা নাই, অমনি তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে চৈতন্য হইলে উক্ত বস্তু দুইটীর জন্য উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। পরে ফজরের নমাজের সময় তাঁহার সামান্য একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি দেখেন, বড় পীর সাহেব বলিতেছেন, হে মুজাফর! তুমি কেন কাঁদ, আমার জামা ত তোমার ঘরেই আছে। নবাবের কি শক্তি যে, তাহা রাখে। এই স্বপ্ন দেখামাত্রই পীর মুজাফরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি বাক্স খুলিয়া সেই অক্ষয় বস্তু

আমি আর আপত্তি করিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা করুন। ওদিকে বড় পীরসাহেব গায়ক আনয়ন করিয়া গানের সভা করিলেন, এবং নিজের পুত্রাদি ও খাজা সাহেব প্রভৃতি বন্ধু বান্ধব সহকারে তথায় বসিলেন। গায়কেরা আরব্য ভাষায় পদ্য পাঠ করিতে লাগিল।

হাতে আছে ওরে ভাই! বল ভাল গান।
করহ নাচন হাত করিয়া লাড়ন॥

খাজা সাহেব নাচিতে নাচিতে চিৎকার আরম্ভ করিলেন। বড় পীরসাহেব স্বয়ং এবং সভাস্থ সমস্ত লোক তাহার মান্যার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। খাজা সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাচিতে থাকিলেন, বড় পীরসাহেব ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটী লোহার আশা নিজের পাক গলার নীচে রাখিয়া যেন ভূমিকে একটু জোরে টিপিয়া রাখিয়া ছিলেন। এমন কি, ইহাতে বড় পীর সাহেবের শরীরে ঘর্ম্ম দিয়াছিল, পরে যখন খাজা সাহেব স্থির হইলেন ও গানের সভা ভঙ্গ হইল, তখন প্রধান প্রধান সেবকেরা বড় পীর সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, হুজুর! যখন খাজা সাহেব সচিৎকারে নাচিতেছিলেন, তখন আপনি কেন আশা দিয়া মাটী টিপিয়া ধরিয়া ছিলেন? পীরসাহেব বলিলেন, মিঞা! যদি আমি আমার নিজ পীরগুণে এই আশা দিয়া মাটী টিপিয়া না ধরিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খাজার চিৎকার শব্দে এই ভুমি ফাটিয়া যাইত। পাঠকগণ দেখুন, খোদাতালা পীরকে কত গুণ দিয়া ছিলেন। অবশেষে খাজা সাহেব পূর্ণ তিন মাস বড়পীর সাহেবের দরগাতে থাকিয়া বিদায় প্রার্থী হন, এবং অনেক কাকুতি মিনতি

হইতেই আমার স্নেহের পাত্র হইয়াছে, কাজেই আমার সঙ্গে আসিয়াছে। আবার ইতিমধ্যে সে আমার মুরিদও হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া বড়পীর সাহেব বহু দয়ার সহিত কেতাবউদ্দিনকে নিজের পাশে বসাইয়া, তাহার শিরে হাত বুলাইলেন, এবং পীর খাজা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাই মইন উদ্দিন! তোমার এই পুত্রটী ভবিষ্যতে সাধু হইবে। ফলেও তাহাই হইল, পীর কেতাব-উদ্দিন সাহেব পরে সর্ব্বপ্রধান সাধু হইয়া ছিলেন। পীর খাজা সাহেব যখন বড় পীরসাহেবের দরগাতে সাত দিন অবস্থিতি করিলেন, তখন বড় পীরসাহেব পীর খাজা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাই মইন উদ্দিন! অনেক দিন হইল, আপনি এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত আপনাকে দাওয়াত করিলাম না। খাজাসাহেব উত্তরে বলিলেন, মিঞা ভাই! আমি প্রত্যহই দু-বেলা নানারূপ সুখাদ্য খাইতেছি, এর উপরে আবার দাওয়াত কারে বলে? বড় পীরসাহেব বলিলেন, ভাই! তুমি যে আমার প্রাণস্বরূপ, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি, সুধা-ভাত ও সামগ্রী তোমার নিকট একই, কিন্তু ইহা ত তোমার মনের খাদ্য নয়, তবে যদি গানের দাওয়াত করা হয়, তবে অবশ্যই তোমার প্রাণের খাদ্য হয়। খাজা সাহেব বলিলেন, হে মিঞা সাহেব! যাহা আপনার গুণময় চরিত্র দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই, তাহা শুদ্ধ আমার জন্য হইবে, ইহা অন্যায়। পীরসাহেব বলিলেন, আমি গান শুনা ঘৃণা করি না, তবে আমার তরিকে উহা শুনা আবশ্যক বা প্রয়োজনীয় নহে, কাজেই শুনা হয় না। ভাল, তোমার জন্য আমিও শুনিয়া লইব। খাজাসাহেব বলিলেন, মিঞা!

পীরসাহেবের একটী আচার্য্যের কেরামতের কথা।

পীর সৈয়দ সাহ গোলাম হোসেন চস্তী আবুল গুলামা (খোদাতালা তাহার মন পাক করেন) তাহার মুখ হইতে এই গল্প শুনা গিয়াছে। যখন নবিসাহেবের আদেশে, পীরখাজা মইন উদ্দিন হোসেন সনজ্জরী চস্তী (তাহার উপরে খোদাতালা সদয় রন) হিন্দুস্থানের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন পীরখাজা সাহেব, নিজের পীর ও মোরসেদ মাননীয় পীরখাজা আসমান হারুতি সাহেবের সঙ্গে (তাহার উপর খোদাতালা সদয় রন) পবিত্র ধাম মদিনা মোনয়ারায় হাজির ছিলেন। হজরত পয়গম্বর সাহেবের রোয়াজা জিয়ারত করার সময় জোনাব পয়গম্বর সাহেব তাঁহাকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন দেন। তখন পীরখাজা আসমন হারুতি সাহেব, পীর-খাজা মইন উদ্দিন সাহেবকে হিন্দুস্থানে যাইতে আদেশ প্রদান করেন; এবং ইহাও বলিয়া দেন যে, তুমি প্রথমে বোগদাদ সরিফে যাইয়া পীর সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, এবং কিছুদিন তাঁহার নিকটে থাকিয়া পরে হিন্দুস্থানে যাইবে। পীর খাজা সাহেব সেখান হইতে প্রথমে সনজ্জরে নিজালয় উপস্থিত হন, পরে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক পীর কেতাব-উদ্দিন বক্তিয়ার আওশী সাহেবকে (খোদাতালা তাহার মন পাক করেন) সঙ্গে লইয়া বোগদাদে যান। অব-শেষে বড় পীর সাহেবের দরগাতে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বড় পীরসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তোমার সঙ্গে পুত্রটী কে? পীর খাজা সাহেব উত্তরে বলিলেন, ভাই! ইহার নাম কেতাবউদ্দিন, এটী শিশুকাল

অন্য এক সাধুজন হয়েছে মরণ।
তার স্থলে অন্য চাই করণ পূরণ॥
ইহা শুনি পীরসাব হুকুমে খোদার।
প্রথমেই ভাল করে দিল চক্ষু তার॥
তারপর সাধুপদ করিল অর্পণ।
নবিবংশ গুণ সবে পাইল দর্শন॥
সরিয়ত মতে চোর ওহে বন্ধুগণ।
দয়া পাবে পাত্র নহে আছিল কখন॥
কিন্তু গুপ্তে পীর জ্ঞান আছিল অপার।
এজন্য করিল দয়া উপরে তাহার॥
গৃহ থেকে শত্রুদিগে করে না নিরাশ।
বুঝরে কেমন গুণ তাহার বিকাশ॥
আর এতে উপদেশ ওহে বন্ধুগণ।
মূর্খরোও জ্ঞানী এতে হবে বিলক্ষণ॥
ঘৃণানেত্রে পাপীদিগে কর না দর্শন।
শেষে গুণী হতে তিনি পারে বিলক্ষণ॥
আহা রে সাধুর গুণ রয়েছে অপার।
করিব বর্ণন শক্তি কোথায় আমার॥
খোদা খোদ তুলে লন কার্য্যটী তাহার।
অন্য পর এ কাজের নাহি দেন ভার॥
কাদের বলেন ঠিক বলিলে আপনে।
পালন করিব ইহা আশা রাখি মনে॥

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

বৃদ্ধার নয়নগোচর হইল। তখন বৃদ্ধা অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া ফেলিল, হে বড়পীর সাহেব, আপনি মোরগের মাংস দিয়া অন্ন খান, আর আমার ছেলে কেন সুধাভাত খায়? পীর সাহেব বুড়ীর এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া নিজের গুণময় হাত সেই মোরগের হাড়ের মধ্যে রাখিয়া, হুকুম দিলেন, মোরগ! যিনি হাড় হইতে জীবন দেন, তুমি তাঁহারই হুকুমে জীবিত হও। পীরসাহেব এই কথা বলামাত্রেই ঐ মোরগটি জীবিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিতে লাগিল। তখন পীরসাহেব ঐ বুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাপুহে! তোমার ছেলেটিও যখন এই মত প্রভুত ক্ষমতাশালী হইবে, তখন সে যাহা ইচ্ছা খাইতে পারিবে।

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেব একটী চোরকে চক্ষু দান করেন, তাহার বিবরণ।

স্থফিনাতে এইমত হয়েছে রচন।
বড়পীর গুণাগুণ ওহে বন্ধুগণ॥
একবার আসে চোর ঘরেতে পীরের।
ইচ্ছা তার পীর অর্থ করিতে বাহির॥
কিন্তু তথা সাধু অগ্নি, আছিল জ্বলিত।
এজন্যেতে অন্ধ চোর হইল ত্বরিত॥
ইতিমধ্যে খাজাসাব হন উপস্থিত।
বলে পীর মন দিয়া শুনহ কিঞ্চিৎ॥

অনন্তর সেই ব্যক্তি পীরের কথামত কার্য্যকরামাত্র বিবি নির্ব্যাধি হইল, এবং পরে কখনও তাহাকে মৃগীরোগ আক্রমণ করে নাই। এমন কি, সেই দিন হইতে পীর সাহেবের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত, সমস্ত বোগ্দাদ সরিফে কাহারও ঐরূপ রোগ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায় ॥

—

পীরসাহেব একটী মৃতমোরগকে জীবন দান করেন, তাহার কথা।

সুকিনাতুল আতনীয়া নামক কেতাব প্রণেতা সাহেব লিখিয়াছেন, একদিন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার বয়স্ক পুত্রসহ মাননীয়, বড়পীর সাহেবের পাক জোনাবে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিল, হে বড়পীর সাহেব! আমার এই ছেলেটি কেবল আপনার নিকটেই থাকিতে ইচ্ছা করে, সংসারের কোন কাজ কর্ম্ম করিতে চায় না। অতএব ইহাকে হুজুরের নিকট রাখিয়া যাই। এ হুজুরের সেবা-তেই সদা নিযুক্ত থাকিবে। পীরসাহেবও তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ছেলেটি পীরসাহেবের দরগাতে রহিল। পীরসাহেব তাহাকে সহ্য, ধৈর্য্য, রাত্রিজাগরণ, উপাসনা করণ ও অল্প ভোজন ইত্যাদি, সাধুর কাজ সাধনা করিতে হুকুম দিলেন। কতকদিন পরে ঐ বৃদ্ধা তাহার ছেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিল, ছেলেটী অল্প অল্প সুধাঅন্ন খাওয়াতে দুর্ব্বল ও কাল হইয়া গিয়াছে, পরে ঐ বৃদ্ধা পীরসাহেবের নিকট গিয়া দেখেন, তিনি উত্তম উত্তম খাদ্য খাইয়া নিজের পাক হাত ধুইতেছেন ও দস্তর খান উঠান হইতেছে। দৈবাৎ ঐখানে, মোরগের হাড়

হইয়া সমস্ত মাঠ কাঁপাইয়া দিল। ভয়ে ডাকাইতেরা আমাদের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, ভ্রাতাগণ! আইস, তোমাদের আপন আপন মালামাল লইয়া যাও। আমরা সেখানে গিয়া দেখি, দুইটী দস্যুদলপতি মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এবং হুজুরের নিক্ষিপ্ত দুইটী পাদুকা তাহাদের মস্তকের নিকট আছে। তখন আমরা নিজের মালামালের সহিত হুজুরের পাদুকা দুইটীও লইয়া আসিয়াছি। উপস্থিত লোকেরা প্রকাশ্যে এই কাহিনী শুনিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল।

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেব একটী মৃগীরোগী আরোগ্য করেন, তাহার বিবরণ।

কথিত আছে,একব্যক্তি বড়পীর সাহেবের পাক জোনাবে হাজির হইয়া আবেদন করিল, হে পীরসাহেব! আমার বিবি মৃগীরোগে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে, এবং এই সহরের যত প্রকারের যত চিকিৎসক আছে, তাহারা সকলেই আপন আপন সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই, কাজেই প্রমাদ গণিতেছি। এখন দেখিতেছি, হুজুরের কৃপা ব্যতীত সেই রোগটী কিছুতেই ভাল হইবে না। শুনিয়া পীরসাহেব বলিলেন, মিঞা! যখন তোমার বিবির মৃগীরোগ উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহার কর্ণের মধ্যে মুখ দিয়া বলিও, অরে মৃগী! এই সহরে পীরআবদুলকাদের অবস্থান করেন, তিনি তোরে হুকুম করিয়াছেন, তুই এখান হইতে চলিয়া যা, আর কখনও আসিস্ না। যদি আসিস্, তবে মারা যাইবি।

মাত্রেই ভয়ঙ্কর চিৎকার করিলেন এবং একটি পাদুকা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, সেই পাদুকা বায়ুবেগে উড়িয়া গেল, তৎপরে অপর একটি পাদুকা ঐরূপ প্রকার ছুড়িয়া দিলেন, সেটাও তৎক্ষণাৎ দৃষ্টির বহির্ভুত হইয়া গেল। পরে তিনি নিজের আসনে বসিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখিয়া কাহারও সাহস হইল না, যে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অনন্তর এই ঘটনার তেত্রিশ দিন পরে, পারস্য হইতে একদল সওদাগর বোগদাদ সরিফে আইসে, এবং তাহাদের প্রধান প্রধান কয়েকজন লোক কতকগুলি টাকা ও আসরফি, এবং অনেক-গুলী রেশমীথান সঙ্গে লইয়া পীর-সাহেবের দরগাতে হাজির হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, বড়পীর সাহেব কোথায়? আমরা তাঁহার জন্যে নজর আনিয়াছি। খাদেমেরা পীর-সাহেবকে খবর দিলেন, তিনিও বাহিরে আসিলেন, এবং আসন লইবার পরে, ঐ সওদাগরেরা সমস্ত নজরের বস্তু পীরসাহেবের সম্মুখে হাজির করিয়া দিল। ঐ নজরের সঙ্গে পীরসাহেবের সেই দুইটি পাদুকা দৃষ্ট হইল। পীর-সাহেব তাহাদের নজর কবুল করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সওদাগর! তোমরা আমার এই পাদুকা দুইটী কোথায় পাইলে? সওদাগরেরা নিজের অবস্থা এইরূপে বিবৃত করিল, হুজুর! সফরের চান্দের, তেশরা তারিখে মঙ্গলবার দিবসে, দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণ করে ও লুঠতরাজ করিয়া, আমাদের কয়েকজনকে কাটিয়া ফেলে। পরে যখন সমস্ত ধন সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিতে থাকে, তখন আমরা হুজুরকে ডাকিলাম এবং নজর মানি-লাম। অমনি কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত

পৃথ্বীর সকলেই পীরসাহেবের অধীনতা স্বীকার করেন, তহার বিবরণ।

বড়পীর সাহেবের তনয়, পীর আবদুল ওয়াহাব ও পীর আবদুরৈজাক সাহেবদ্বয় (তাহাদের উপরে খোদাতালা সদয় রন) বলিতেছেন, পাঠকগণ! একদিন পিতাসাহেব, দরগাতে উপবিষ্ট হইয়া দুগ্ধ পান করিতেছিলেন, হঠাৎ দুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া, মোরা কেবা (ধ্যানে মগ্ন) হইলেন। এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই থাকিলেন। শেষে শির তুলিয়া বলিলেন, বাবা শুন, এখন আমার মনের মধ্যে, সত্তরটি বিদ্বার দ্বার খোলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক দ্বার এরূপ কোসাদা, যেমন আসমান ও জমিনের মধ্যে ব্যবধান, আর সমস্ত পৃথিবীর দরবেশগণ, আমার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং সমস্ত নদ নদী পর্ব্বত আদিও আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়াছে।

বড়পীর কর দয়া, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেব ডাকাইতের হাত হইতে, সওদাগরদিগকে
রক্ষা করেন, তাহার বিবরণ।

পাঠকগণ! শ্রবণ করুন, পীরআবু আমার জারি কি ও পীর আবুমহম্মদ আবদুল হক, (খোদাতালা তাহাদের মন পাক করুন) স্পষ্ট বলিতেছেন যে, সফরের চান্দের তেসরা তারিখে, আমরা দুই জনে, বড়পীর সাহেবের দরগাতে, তাঁহার খেদমত করিতেছিলাম। দৈবাৎ দেখিলাম, তিনি উঠিয়া ওজু করিলেন, পরে দুই রেকতে নকল নমাজ পড়িয়া সমাপ্ত করিলেন। নমাজ শেষ হওয়া

পদ্য

আশীর্ব্বাদ কৈল যবে মুখে আপনার।
তখনি মঞ্জুর হৈল, নিকটে খোদার ॥
ইহা দেখি সেই বুড়ী, সন্তুষ্ট অপার।
জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে, ভুমে একেবার ॥
পুনঃ যবে জ্ঞান তার হইল উদয়।
সত্যপ্রেমে পীর দিকে, ছুটিল নিশ্চয় ॥
যদিও সন্ধান তার, করিল বিস্তর।
কিন্তু সেই চন্দ্র নাহি হইল গোচর ॥
ওহে পীর তোমা দ্বারা, গৌরব ধর্ম্মের।
একবার কর দৃষ্টি, উপরে মোদের ॥
যখন আসিল তীরে, বাক্যেতে তোমার।
কুড়িসন পূর্ব্বে তরী, ডুবেছিল যার ॥
মোরা ত পাপের নদে, হয়েছি মগন।
কত কাল আর তথা, থাকিব বন্ধন ॥
দয়া করি করে ধরি করহ বাহির।
রিপু নদে ডুবে তরী, হয়েছে অস্থির ॥
দুঃখ মনে করিয়াছ কর্ত্তেছি অপার।
পৌঁছিব বোগ্দাদে আমি এই আশা সার ॥
কিন্তু দয়া সর্ব্ব স্থানে, রয়েছে তোমার।
মনোদুঃখ অবগত, আছে সবাকার ॥
একবার কর দৃষ্টি, উপরে মোদের।
দগ্ধ মনে দেও ফল, গুণেতে নিজের ॥

বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায় ॥

বিষয়ে দৃষ্টি না করিবেন, সে পর্য্যন্ত, আবদুল কাদের এখান হইতে উঠিবে না, অচল অটল হইয়া বসিয়া রহিবে। হে পাঠকগণ! একবার দেখুন, খোদা ও খোদার দোস্তের মধ্যে কিরূপ আদর অভ্যর্থনা ও মান্য মর্য্যাদা রহিয়াছে।

যেই পীরসাহেবের মুখ হইতে, দোয়া বাহির হইল, অমনি খোদার দরগায় মঞ্জুর পড়িল। জনগণ খোদাতালার অসীম মহিমা ও পীরসাহেবের অপূর্ব্ব কেরামত দেখিতে পাইল। সেই বিশ বৎসরের ডুবাতরী, পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরমুখে ছুটিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঘাটে পৌঁছিল, ওদিকে বরযাত্রীর সমস্ত লোক, দুলা দোলাহিনকে মহাখুসীর সহিত তরী হইতে তীরে তুলিল। পাঠকগণ! আপনারা দেখিলে মনে করিতেন, যেন এখনই বিবাহ করিয়া আসিতেছে। বড়ই হাসি খুসি, এবং নাগারাদি পিটিয়া, ধুম ধামে, বাড়ী পৌঁছিল। বুড়ীর আহ্লাদের সীমা নাই। সে ত হারাধন ঘরে পাইল, বৃদ্ধকালে যুবতীর ন্যায় হইল। পাঠক! এই তরী ডুবার দিন, সমস্ত সহরের লোক যেরূপ শোকাকুল হইয়াছিল, আজ আবার সেই মতই, সমস্ত সহরে আনন্দের স্রোত বহিল। পীরসাহেবের এই গুণাগুণ মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত সহরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক পীরসাহেবকে দেখিতে আসিল। মুসলমানের ত কথাই নাই, অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা সোনাতন এসলাম ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, পীরসাহেবের হস্তে মুরিদ হইল। অনন্তর বহুলোকের সমাগমে পীরসাহেব অন্তর্হিত হইল।

—

সকলেই বলিতেছিল, নামিয়াই হাসি খুসী করিব। কিন্তু হায়! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, দৈবাৎ একটী বায়ু আসিয়া, দুলা দুলহিন যাত্রীলোক সহকারে তরীটা ডুবাইয়া দিল। যাত্রী একটীও রক্ষা পাইল না। কেবল এই বুড়ি বেটী ভাসিয়া তীরে উঠিল। হুজুর, এই জন্যই সমস্ত সহরে শোক পড়িয়া গিয়াছিল। হে পীরসাহেব! আজ কুড়ি বৎসর হইল, এই ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই শোকাকুল বুড়ী আজও সেই অবস্থায় আছে। অর্থাৎ প্রতিদিন যখনই এইস্থানে জল লইতে আইসে, তখনই বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে থাকে। তাহার এই সকরুণ রোদন দেখিয়া, পথিকেরাও রোদন করিতে থাকে। বুড়ির এই দুঃখের কথা শুনিয়া পীরসাহেবের দয়ারূপী সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। তিনি একটী লোক পাঠাইয়া বুড়ীকে বলিলেন, তুমি ক্ষান্ত হও, কোন চিন্তা করিও না, তোমার আশা এখনই পূর্ণ হইবে। এই কথায় বুড়ীর কোন প্রত্যয় হইল না, সুতরাং সেই ভাবেই কান্দিতে লাগিল। পীরসাহেব পুনর্ব্বার লোক পাঠাইয়া, অনেক প্রবোধ বাক্য বলিলেন। ইহাতে বুড়ি একটু সুস্থির হইল। ওদিকে বড়পীর সাহেব, সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার দরগায় হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন, হে নিরুপায়দের রক্ষক, হে দুঃখিদের কার্য্যকারক, এই বিদ্ধার ও তাহার পুত্রের ও যাত্রীলোকের ঘটনা যাহা আপনি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন, তাহা সকলের সুকৌশলে তাহাদের বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দেন, কেন না, আপনার কৃপার আশা দিয়া, আমি এই বুড়ীকে বসাইয়া রাখিয়াছি। এখন আপনি জানুন, যে পর্য্যন্ত আপনি এই

পীরসাহেব কুড়ি বৎসরের মরা এক দল লোক তাজা করেন,
তাহার বিবরণ।

শুনা যায়, একদিন বড় পীরসাহেব ভ্রমণ করিতে করিতে নদীর তীরে উপস্থিত হন। তখন নদীর স্রোত অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। এবং বায়ু লাগিয়া বড় বড় ঢেউ উঠিতেছিল। সুতরাং পীরসাহেব মনঃতুষ্টির জন্য সেই ঘাটে কয়েক ঘণ্টা বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন। এমন সময় নদীর তীরবাসী স্ত্রী-লোকেরা ঐ ঘাটে জল লইতে আইসে এবং সকলেই আপন আপন কলসী ভরিয়া জল লইয়া চলিয়া যায়, কেবল একটী বুড়ি জলশুদ্ধ কলসীটী তীরে রাখিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় করিয়া কান্দিতে লাগিল। আহা! তাহার সেই করুণ রোদন শুনিয়া অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইতে লাগিল। পীরসাহেব ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, এবং উপস্থিত লোকদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, বুড়ির কি হই-য়াছে। তাহারা সকলেই বলিল, হে ধর্ম্মের বাপ! হে বড় পীরসাহেব! এই বুড়ীর দুঃখ বড়ই ভয়াবহ, হজরত ইয়াকুব আলায় হেচ্ছালামের চেয়েও এই বুড়ীর দুঃখ বেশী। আহা! ইহার মাত্র একটী পুত্র ছিল, তাহাও প্রায় ইউছফ আলায় হেচ্ছাল্লামের তুল্য হইবে। এই শোকাকুল বুড়ী বড়ই সন্তুষ্ট মনে ছেলেটীর বিবাহ কোন স্থানে স্থির করিয়া খুব ধুমধাম সহকারে বর সাজাইয়া, বাজনা বাজাইয়া বন্ধু বান্ধব নিয়া বিবাহ কার্য্য শেষ করিয়া জাহাজে চড়িয়া বাড়ী গমন করে। যখন জাহাজটা এই ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সকলের মনই উল্লাসিত,

এবং সে সদাসর্ব্বদা তাহার পাছে পাছে ঘুরিত। একদিন ঐ স্ত্রীলোকটী কোন কার্য্যবশতঃ নির্জ্জন বনে গিয়াছিল। লোচ্চাও সময় বুঝিয়া ঐ স্থানে লুকাইয়া ছিল। স্ত্রীলোকটীকে একা পাইয়া সে তাহার সতিত্বনাশের চেষ্টা করিল, স্ত্রীলোকটীর তখন আর কোন উপায় ছিলনা, সুতরাং মনে মনে বড়পীর সাহেবকে স্মরণ করিয়া বড়ই দুঃখের সহিত নালিশ করিল ও বলিল, হে বড়পীরসাহেব! আমার নালিশ লউন, নালিশ লউন! এই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ঐ সময় পীরসাহেব ওজু করিতে ছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার আলোকিত মুখ রাগান্বিত হইয়া উঠিল। সত্বর তিনি সেই বনের দিকে একটী পাদুকা ছুড়িল। পাদুকাটী তীরের ন্যায় গিয়া সেই পাপিষ্ঠের মাথায় প্রহার করিল। তাহাতে পাপিষ্ঠের খুলী ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল, এবং জিহ্বা বাহির হইয়া সেই দণ্ডেই সেই খানেই পড়িয়া মরিয়া গেল। পরে ঐ স্ত্রীলোক, খোদাতালার সোকর গোজারী করিয়া, পীরসাহেবের পাদুকা হস্তে লইয়া তাঁহার পাক জোনাবে হাজির হইয়া, সমস্ত কথা নিবেদন করিল। আর পূর্ব্বাপেক্ষা পীরের প্রতি অশেষ ভক্তি দেখাইতে লাগিল।

পদ্য

যাহারে ক্ষমতা বাবা দিয়াছে খোদায়।
বালাই ফিরাতে শক্তি, আছে ঠিক তায়॥
দেখ পীর রাখে, হতে শীরেতে যাহার।
কেন নয় ভাল তার, হইবে অপার॥
বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

আমার নালিশ মুঞ্জুর করুন। চিনিসহ উষ্ট্র আমাকে দান করুন। এই কথা বলিবামাত্রই, সে দেখিতে পাইল, পর্ব্বতের উপর হইতে, একটী সাদা জামাপরিহিত লোক তাহাকে ইসারা করিতেছে; হে সওদাগর! এদিকে আইস, এদিকে আইস। যখন সওদাগর সেখানে গেল, তখন দেখিতে পাইল, সেই ভদ্রলোকটী সেখানে নাই। কিন্তু চিনি বোঝাই ছয়টী উষ্ট্র তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সওদাগর ইহা দেখিয়া এমন তুষ্ট হইল যে, লিখিয়া শেষ করা যায় না। সে পীরসাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাহার মুখ যেন চিনিতে ভরিয়া গেল।

পদ্য

সেই চিনি পেয়ে, মুখ হল চিনিময়।
সমস্তই তিক্ত তার হয়ে গেল লয়॥
মিষ্ট পেয়ে কেন তুষ্ট হবে না তখন।
তিক্ত মুখে, চিনি দিলে মিষ্ট বিলক্ষণ॥
সেইমত মিষ্ট মুখ করহ আমার।
মিষ্টভাষী কর, মোরে সমান তোমার॥
বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেব একটী সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করেন, তাহার বিবরণ।

উক্ত আছে যে, একটী সতী সাধ্বী, পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক বড়পার সীহেবের পরম ভক্ত ছিল। সেই স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের ইচ্ছা একটী কম জাত লোচ্চা সদা মনে করিত,

পুত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য মনে খোদাতালার সোকর গোজারী করিল, এবং যাবজ্জীবন পীরসাহেবের প্রশংসা করিতে লাগিল।

পদ্য

তোর দ্বারে আসে যেই হয়ে নিরুপায়।
নিরাশ হইয়া ফিরে, না যায় কোথায়॥
মনোদুঃখে তব পাশে, করিলে রোদন।
নারীকেও নর কর্ত্তে, পার সেই ক্ষণ॥
খোদা খোদ করেছেন, এ গুণ অর্পণ।
যারে ইচ্ছা, তারে তুমি কর সমর্পণ॥
মোর কান্না যদি কিছু, করুন শ্রবণ।
দয়াগুণে, ভাল কর্ত্তে, পার সেইক্ষণ॥
বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসা[illegible]ব একটী সওদাগরকে উষ্ট্র দান করেন, তাহার বিবরণ।

বর্ণিত আছে, একটী সওদাগর, কয়েকটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চিনি বোঝাই করিয়া কোন দেশে গমন করিতেছিল। দৈবাৎ পথিমধ্যে, তাহার ছয়টী চিনি বোঝাই উষ্ট্র খোয়া যায়, সওদাগর যদিও অনেক অন্বেষণ করিল, কিন্তু উষ্ট্রের কোনও সন্ধান পাইল না। সওদাগর দুঃখে ম্রীয়মাণ হইয়া পড়িল। ভাই মনে রাখিও, ঐ সওদাগরটী বড়পীর সাহেবেরও পরম ভক্ত ছিল। সেই জন্যই, সে খুব জোরে চিৎকার করিয়া বলিল, হে বড়পীর সাহেব! চিনি বোঝাই আমার ছয়টী উষ্ট্র খোয়া গিয়াছে, আমি হতভাগা,

পীরসাহেব কুড়িজন স্ত্রীলোককে পুরুষ করেন, তাহার বিবরণ।

কথিত আছে যে, একটী স্ত্রীলোকের উপর্য্যুপরি কুড়িটী মেয়ে হওয়ায়, তাহার স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ বিবিকে তালাক দিয়া পুনঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়,তাহার ধারণা, বিবাহ করিলে হয়ত তাহাতে পুত্রও হইতে পারে। স্ত্রীলোকটী যখন পতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল, তখন বড়ই দুঃখিত হইল এবং উপায় না দেখিয়া পরিশেষে বড় পীর সাহেবের পাক জোনাবে হাজির হইয়া আপন মনোদুঃখ নিবেদন পূর্ব্বক নিরুপায় ভাবে পীরের পদে পড়িয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কান্দিয়া প্রার্থনা করিল, হে দয়াময় পীরসাহেব! আপনার এই দাসীর জন্য দোয়া করুন। যেন সেই পরম কারুণিক খোদাতালা আমাকে একটী পুত্রধন দান করেন। কারণ, তাহা হইলে আমার স্বামী তুষ্ট হইয়া আমাকে রাখিবেন। ঐ স্ত্রীলোকটীর কান্নাকাটী দেখিয়া পীর সাহেবের দয়ারূপী নদী উথলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে হুকুম দিলেন, যাও, চিন্তা করিও না, তোমার পুত্র হইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক অজ্ঞ, তাই সেই স্ত্রীলোকটী, মনে মনে বলিল, হায় রে! পীর সাহেবতো খোদার নিকট আমার জন্য কোন দোয়াও করিলেন না, এবং তাবিজও দিলেন না। তবে কেমনে বলিল, তোমার পুত্র হইবে। হয়ত আমাকে ভুলাইবার জন্য এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন। পীর সাহেব তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি শীঘ্র বাড়ী যাও, দেখিবে তোমার সকল কন্যাই পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী আশ্চর্য্য হইয়া বাড়ী অভিমুখে দৌড়িল। বাটীতে গিয়া দেখে, সত্যই সমস্ত কন্যা

করিলেন। উত্তরে পীরসাহেব বলিলেন, হাঁ, এই ঘটনা তোমার উপরে নিশ্চয়ই ঘটিত, তবে আমার নিকট হইতে হুকুম লওয়ার জন্য খোদাতালা তাহা তোমার উপরে স্বপ্নের আকারে দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন তুমি সেই সত্য, গুণময় খোদাতালার সোকর গোজারী কর, এবং তাহার কিছু নজরানা দীন দুঃখীদিগকে দান কর। সেই বণিক পীরসাহেবের চরণযুগলে প্রণাম করিয়া সযত্নে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

পদ্য।

তুমিই ত খোদা দোস্ত, গৌরব কালের।
করহ করুণা দৃষ্টি উপরে মোদের॥
যে দুঃখী উপরে দৃষ্টি হইবে তোমার।
করিবে তাহার কষ্ট স্বপন আকার॥
আহা রে! প্রত্যয় যেই করিবে তোমায়।
দয়াবারি তার প্রতি করিবে সদায়॥
এ দাস রিপুর হাতে রয়েছে কাতর।
নিজগুণে রক্ষা দাসে করহ সত্বর॥
রক্ষা পাই যেন রই, তার দৌরাত্মায়।
পুণ্যকর্ম্মে আর যেন থাকি সর্ব্বদায়॥
বড় পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

—

পীরসাহেব একটী সওদাগরকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করেন, তাহার বিবরণ।

কথিত আছে যে, একটী সওদাগর বাণিজ্যযাত্রা করিবার জন্য আপন পীরের নিকটে অনুমতি চাহিলে, তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন, এবারকার বাণিজ্যে তোমার বহু ভয়ের কারণ আছে, তোমার ধন দস্যুগণ হরণ করিয়া লইবে, অতএব তুমি এবার ক্ষান্ত হও, বাণিজ্যে বাহির হইও না। তোমার এই মন্দ সময় শেষ হইয়া ভাল সময় আসিলে, বাণিজ্যে বহির্গত হইও। অপরদিকে ঐ সওদাগর বড় পীরসাহেবেরও পরম ভক্ত এবং আজ্ঞাকারী ছিলেন। একদিন ঐ সওদাগর নিজের বাণিজ্য যাত্রার কথা ও ঐ পীরের নিষেধ বার্ত্তা আদ্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় পীরসাহেবের নিকট নিবেদন করিলেন। বড় পীর সাহেব বলিলেন, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাণিজ্যে যাও; কোনও ভয় করিও না, খোদাতালা স্বয়ং তোমাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, এবং তুমি বিস্তর লাভ পাইবে। ঐ সওদাগর গুণময় বড় পীরসাহেবের আজ্ঞামত বাণিজ্যে গেলেন, এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিলেন। পথিমধ্যে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন দস্যুতে তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া লইয়াছে, এবং তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। জাগ্রত হইলে ঐ সপ্নের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না, কেবল মাত্র তাহার গ্রীবাদেশে একটী ক্ষতের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। ফল কথা, যখন তিনি নিজ ভবনে আসন লইলেন, তখন বড় পীরসাহেবের পাক জোনাবে হাজির হইয়া, ঐ স্বপ্নের কথা আদ্যন্ত বর্নন

পীরসাহেবের শরীর হইল একটী, তিনি একই সময় সত্তর বাড়ীতে কিরূপে উপস্থিত হইয়া ছিলেন? ওদিকে পীর সাহেবের মন দর্প্পণ অপেক্ষাও পরিষ্কার, এবং সূর্য্য অপেক্ষা আলোকিত ছিল। কাজেই তিনি সেই সময় গোলামের মনের কথা জানিতে পারিলেন। আবার তখন তিনি নিজের দরগার সম্মুখে একটী বৃক্ষতলে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। সেইখানে ঐ গোলামকে ডাকিয়া গরম নজরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে! তোর মনে কি বল, শুনি। গোলাম পীরসাহেবের ভয়ে সকল কথাই স্পষ্ট-রূপে আবেদন করিল। তখন পীরসাহেব তাহাকে হুকুম দিলেন, ওরে মুর্খ, তুই চক্ষু তুলিয়া এই বৃক্ষটী দেখ। সে যেই চক্ষু তুলিয়া উপরে দৃষ্টি করিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, পীরসাহেব গাছের প্রতি পাতার উপরেই আপন পৃথক কায়া সহ বসিয়া আছেন। আবার পীর-সাহেব বৃক্ষের তলেও যেরূপ চলিতে ছিলেন, সেইরূপই চলিতেছেন।

গোলাম পীরসাহেবের এ অতি চমৎকার গুণ দেখিতে পাইয়া মোহ গেল, আর তাহার মনের সমস্ত গোল মনেই একেবারে মিটিয়া গেল, এবং তাহার মনে নবভাবে পীরের ভক্তি জন্মিল।

পদ্য

করেন গৌরব খোদা দিছে অধিকার।
আশ্চর্য্য দর্শন হয় এজন্মেতে আর।
বড় পীর দয়া কর মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়।

পদ্য।

ধরিলে রোগীর হাত ধর্ম্মের জীবন।
জগতে হইল রাষ্ট্র ইহারি কারণ॥
ফুঁক দিয়া মসী, তাজা করিছে মৃতার।
ধর্ম্ম আর মন তাজা গুণেতে তোমার॥
বড় পীর দয়া কর মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়।

বড় পীরসাহেব একদিনই সত্তর বাড়ীতে এফতার করিবার বিবরণ।

কথিত আছে যে, রমজান সরিফের মধ্যে একদিন সত্তরজন লোকে একে অপরের অসাক্ষাতে বড়পীর সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। সাহেব! অদ্যকার দিবস এই হতভাগা দাসের আলয় কৃপা করিয়া আগমন পূর্ব্বক সেইখানেই রোজা এফতার করিয়া, এই নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য দাসকে চরিতার্থ করিবেন। ওদিকে সাদর নিমন্ত্রণ, কাজেই তিনি প্রত্যেকের দাওয়াতই স্বীকার করিলেন, এবং নিজের পবিত্র আশ্চর্য্য গুণেতে একই মুহূর্ত্তে, সকলের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রোজা এফতার করিলেন, এবং মগরবের নমাজ নিজ দরগায় উপস্থিত হইয়া মুরিদ ও ছাত্রদের সহকারে নিরূপিত সময়ে আদায় করিলেন। আহারে যখন পীরসাহেবের এই গুণের চর্চ্চা সমস্ত বোগ্দাদে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন সকলেই স্বীকার করিল, পীরের গুণে ইহা হইতে পারে। কিন্তু একটী গোলামের মনের মধ্যে এই বলিয়া গোল পড়িয়া গেল, দেখ ভাই!

পীরসাহেব কিরূপে ধর্ম্মের জীবন উপাধি পান তাহার বিবরণ।

শুনা যায়, এক ব্যক্তি পীরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বড় পীরসাহেব! আপনার উপাধী মহিউদ্দিন (ধর্ম্মের জীবন) কি প্রকারে হইল? তিনি কহিলেন, বাপুহে! আমি হিজরী পাঁচ শত এক সনে যখন সফর হইতে সহরে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন জুম্মার দিন। সেই দিন সহরের পার্শ্বে একটী রুগ্ন বৃদ্ধকে মাটীর উপর শুইয়া থাকিতে দেখিলাম। কিন্তু তাঁহার মুখটী পূর্ণিমার চন্দ্রসম স্নিগ্ধ এবং সূর্য্যের ন্যায় ঝক ঝক্ করিতেছে। তিনিই আমাকে ডাকিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে ধরিয়া বসাও।" আমিও তুলিয়া বসাইলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, সাহেব! আপনি কোন্ গুণময় ব্যক্তি?" তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে চিনিতে পার না? আমিত, তোমার দাদার দিন, (ধর্ম্ম) বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সর্ব্ব শক্তিময় খোদাতালার প্রশংসা করিতেছি, যে তোমার সাহায্যে পুনর্ব্বার নবজীবন ও অসীম বল প্রাপ্ত হইলাম; তুমি মহীউদ্দিন (ধর্ম্মের জীবন) হও। পরে আমি তাহাকে সেই খানেই রাখিয়া জুম্মার মস্‌জিদে চলিয়া আসিলাম। মসজিদে আসিবার সময় অনেক লোক আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং কেহ কেহ আমার হাত চুম্বন করিতে লাগিল, আবার কেহ বা আমার পদে চক্ষু লাগাইতে লাগিল, এবং সকলেই বলিতে থাকিল, ইয়া মহীউদ্দিন! ইয়া মহীউদ্দিন! (হে ধর্ম্মের জীবন)। সেই দিন হইতেই আমি মহীউদ্দিন উপাধি প্রাপ্ত হইলাম। মহিউদ্দিন অর্থ ধর্ম্মের জীবন।

বুসাইদ হইতে পীর আবদুল কাদির।
পড়িয়া ফকিরী জামা হয়েছেন স্থির ॥
বুউল হোসেন হতে প্রাপ্ত বুসাইদ।
হোসেন ফরাহ হইতে, শুন এই ভিদ ॥
আবদুল ওয়াহেদ হতে, প্রাপ্ত হন তিনি।
এইত উত্তম জামা, শুন ভাই জ্ঞানী ॥
সব্‌লী থেকে প্রাপ্ত তিনি হন এই ধন।
জোনায়েদ হতে, তিনি জান সর্ব্ব জন ॥
সোরী হতে জোনায়েদ ছিলেন পাইয়া।
মারুফ হইতে সোরী নিয়াছিল গিয়া ॥
মারুফ ছাউদ থেকে পায় এই ধন।
হবিব হইতে তিনি শুন বন্ধুগণ ॥
তিনি ইহা পান, হতে হোসেন বশরী।
তিনি বুহোসেন হতে, যিনি কৃপা স্মরি ॥
তিনিত জামতা হন মোদের নবীর।
আর তারে পীর মানে লোক পৃথিবীর ॥
এইত গৌরবী জামা, করে তারে দান।
স্বয়ং গুণময় নবি, শুনহ বিধান ॥
আর সে নবিকে দিয়াছিলেন খোদায়।
দুঃখী জন্যে অহঙ্কার বলে তিনি তায় ॥
এ জন্যই যত আর প্রেরিত প্রধান।
ইনিই হইল তার কৃপার আধান ॥
বড়পীর কর দয়া, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায় ॥

বলিলেন, হে! বাদসা আবদুল কাদের! আমার বলা তোমার জন্য যথেষ্ট হয় নাই। (তাঁহার বলারও আবশ্যক ছিল) তৎপর আমাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া রুটী আনিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমার মুখে তুলিয়া দিলেন। আমি পেট ভরিয়া ভক্ষণ করিলাম। পানিও তিনি নিজ হস্তে পান করাইলেন। আমি স্থির হইয়া বসিলাম। তখন তিনি পিরি জামা নিজ হস্তে আমার গায়ে পরিধান করাইয়া দিলেন।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, কাদরিয়া পীরীর উচ্চ সজরার মেল, এই ভারতবর্ষের সমস্ত দরবেশগণের ঘরে ঘরে এই নিয়মে পরম্পর চলিয়া আসিতেছে। যথা পীর মারুক কুরখী সাহেবের উপরে এইরূপ মেল পড়িয়াছে। যথা,—পীর মারুক কুরখীসাহেব খেলাফতি ও ফকিরী জামা পরিধান করিয়াছেন, পীর এমাম আলিমুসা রেজা আলায় হেচ্ছালাম হইতে তিনি পাইয়াছেন, পীর মুসা কাজেমসাহেবের নিকটে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, পীর এমাম জাফর ছাদেক সাহেবের নিকটে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পীর এমাম মহম্মদ বাকর সাহেবের নিকটে তিনি প্রাপ্ত হন। পীর এমাম জেয়নলআবদিন সাহেবের নিকটে তিনি পাইয়া ছিলেন। পীর এমাম হোসায়েন সহিদে কারবালা সাহেব হইতে তিনি পাইয়া ছিলেন। হজরত আলি মরতুজা মুস্কিল কোসাসাহেব হইতে, কিন্তু অন্য এক গ্রন্থে অন্যরূপ উল্লেখ আছে। যথা,—পীর মারুককুরখী, পারিজামা পীর দাউদ হইতে প্রাপ্ত হন। সেই গ্রন্থকার উহাকে পত্তে লিখিয়াছেন। উপরি উক্ত পীরসাহেবের সকলের উপরে খোদাতালা রাজি থাকুন।

কেহই আমাকে পান আহার করাইল না। তৎপরে একজন লোক আসিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য আমার সম্মুখে রাখিয়া, চলিয়া গেল। ক্ষুধায়ও বলে, খাও খাও, আর কত দিন বসিয়া থাকিবে? কিন্তু আমি বলিলাম, খোদার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না! অপর দিকে উদর হইতে রোদনের শব্দ শুনিতে লাগিলাম, বলিতেছে, ক্ষুধায় মরিয়া গেলাম, মরিয়া গেলাম। কিন্তু আমি তার দিকে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিলাম না। দৈবাৎ মহাত্মা পীর আবুসাইদ মবারক মাখদুমী (খোদাতালা তাহার মন পবিত্র করেন) সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি ঐ প্রকার রোদনের শব্দ শুনিয়া আমার নিকটে আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে! সৈয়দ আবদুল কাদের, এটী কেমন নালিশ, ও কেন এত চিৎকার ধ্বনি? আমি উত্তর করিলাম, সাহেব! এই অধৈর্য্য চিৎকার, রিপুর, কিন্তু আমি নিজে খোদাতালার প্রশংসা করিতেছি, দেখুন আমার প্রাণটী, খোদাতালার মারফতে, স্থির, ধীর ও মজবুত আছে। পীর আবুসাইদ সাহেব বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে আইস, কিন্তু তিনি এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, কখনই খোদাতালার বিনা হুকুমে উঠিব না। এই বলিয়া বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে খোজা খেজের আলয় হেচ্ছালাম সাহেব আসিয়া বলিলেন, আবদুল কাদের! ইহাই খোদাতালার অভিপ্রায় যে, তুমি উঠিয়া আবু সাইদের খেদমতে হাজির হও। তখন আমি উঠিয়া পীর সাহেবের নিকট যাইয়া দেখিলাম, তিনি আমার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এবং আমাকে দর্শনমাত্রই

অবস্থিত হইয়া সেই সভাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ছিল। সে সময় সমস্ত পৃথ্বীর কোনও সাধু স্কন্ধ নীচু করিতে বাকি ছিল না, মাত্র পারস্যের একটী দরবেশ। তিনি স্কন্ধদেশ নীচু না করায়, সেই দণ্ডেই তাঁর পীরি ও ফকিরী বিনাশ পায়। কথিত আছে যে, মহাত্মা বড় পীরসাহেবের এই কথাটী বলার কারণ, খোদাতালার অসীম দয়া দান, প্রাপ্তি ও পয়গম্বর সাহেবের বংশধর, এবং তাঁহার অসীম কৃপা পাইয়াই বলিয়া ছিলেন। পৃথ্বীর মধ্যে আর কোনও দরবেশ এত বড় উচ্চ আসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কেন না, খোদাতালাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি দান করেন, যাকে তাঁর ইচ্ছা হয়। আর তাঁর দয়াই সর্ব্বপ্রধান।

বড়পীর কর কৃপা, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেবের পিরিজামা পরিধান করিবার বিবরণ।

প্রধান প্রধান পুস্তকে উল্লেখ আছে, বড়পীর সাহেব (তাহার উপরে খোদাতালা সদয় রন) পীরি জামা, পীর আবুসইদ মোবারক মাখছুমি, (খোদাতালা তাহার রায় পবিত্র করেন) আজিজির পবিত্র হাত দিয়া পরিধান করিয়াছেন। তাহার খোলাসা এরূপ লেখা আছে যে, স্বয়ং বড় পীরসাহেব বলিতেছেন, আমি একবার মনে মনে খোদাতালার দরগায়, প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমাকে কেহ আহার করাইয়া না দিলে, আমি আহার করিব না, এবং জল মুখে তুলিয়া না দিলে পান করিব না। ওদিকে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত বিনা পানাহারে বসিয়াই থাকিলাম, কিন্তু

মেল বড়ই লম্বা ছিল। পীরসাহেবের সুমিষ্ট বাক্যরূপী নদী খুব জোরে তোড় উথলিয়া, সাগরের আকার ধারণ করিয়া ছিল, এবং পীরসাহেবের কথার ঢেউ প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতেছিল; যদি কেহ দেখিত, তবে বলিত, যেন এই উদ্যান হইতে অনবরত পুষ্প বিতরণ হইতেছে। আর নায়কেরা তাহা আপন আপন বাঞ্ছামত বোঝা বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে জোনাব গৌসিয়েত মাব আজ্ঞা করিলেন, হে জনগণ! আমার এই চরণ সমস্ত ঈশপ্রেমির স্কন্ধের উপরে আছে। এই কথা শুনিবামাত্রই পীরআলি হোব্বী (তাহার উপর খোদা সদয় রন) পীরসাহেবের মেম্বরের উপরে উঠিয়া, পীর সাহেবের চরণযুগল আপন স্কন্ধে লইলেন; এবং বড় পীর সাহেবের গুণময় জামা দিয়া, আপন শির ঢাকিলেন। পরে পর্য্যায়ক্রমে, সমস্ত খোদাতালার ভক্তেরাই আপন আপন স্কন্ধ পীর সাহেবের চরণের নিম্নে রাখিলেন। পীর আবুসাইদ কিলুবী (তাহার উপর খোদা সদয় রন) নিজে বলিলেন, বাপুহে! যখন বড় পীরসাহেব এই বচন উচ্চারণ করিলেন, তখন আমি নিজের চক্ষেই দেখিলাম যে, পবিত্র খোদাতালা, ঐ মহাত্মার মন আলোকিত করিয়া ছিলেন, এবং সদাশয় গুণময় নবি-সাহেব (তাঁহার উপরে খোদার দয়া বারি বর্ষণ হয়) ফেরেস্তাগণ ও সাধু সহকারে ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া একটী নুরানী জামা বড় পীরসাহেবের গাত্রে সযত্নে পরাইয়া দিলেন। অর্থাৎ সমস্ত আওলিয়া ও আম্বিয়াগণ, মৃত কি জীবিত, কাহারও বা আত্মা কাহারও বা কায়া, সেই সভাতে উপস্থিত ছিল, আর দৈত্য ও দেবগণ বায়ুর উপরে

মনে আর বহু কষ্ট, পায় সর্ব্বদায়।
পড়িয়া রিপুর টিপে, করে হায় হায়॥
দুনিয়ার কাজে চিন্তা, হচ্চে বিলক্ষণ।
মনেতে বিরক্তিভাব, করে বিতরণ॥
হায় নষ্ট পাইতেছি, ভয়েতে কালের।
রেখেছি ভরসা মাত্র তোমার দানের॥
তাই দয়া নেত্রে মোরে করহ দর্শন।
রিপু হাত হতে, তবে পাইব রক্ষণ॥
বড় পীর দয়া কর মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়।

সমস্ত দরবেশগণ বড় পীরসাহেবের পদ আপন আপন কান্ধে লয়, তাহার বিবরণ।

দারা সম্রাটের ন্যায় মাননীয় সম্রাট, মহম্মদ আনার আল্লা বুরহানা, সফিনাতুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মিঞা মহাত্মা বড় পীরসাহেব (তাঁহার পর খোদা সদয় রন) একদিন যখন নিজের আসনে আরোহণ করিয়া উপদেশ দান করিতে ছিলেন, তখন পীরআলি হোব্বী ও পীর বকাই বেনবতু, পীর আবুসইদ কিলুবী, পীর আবুনজিরসহরওরদী, পীর আবুমসউদ, পীর আবু-ওলবারাকত, বেন মাদানুল এরাকি, পীর সাহাবউদ্দিন, সহর ওরদী, আর পীর গৌসে কদ্দস, আসরার হোম এবং ইহাদের সমকক্ষ আরও বড় বড় পীরগণ প্রায় শতজন পার হইবেন, সেই মাননীয় সভাতে উপস্থিত ছিলেন। ও দিকে মহবুবে সোবহানি মেম্বরের উপরে আরোহণ করিয়া, উপদেশ দিতে ছিলেন। তখনকার উপদেশের

শুনিতেন, তিনিই আশ্চর্য্য হইতেন। তখন সকল শ্রোতা-গণ বড় পীরসাহেবের কেরামত (আশ্চর্য্য ঘটনা) ও সদয়-তার উপর ইমান আনিয়া দোয়া ও দরূদ পড়িতে লাগিল। তৎপর পরদিবস, ঐ সওদাগর যখন নিজের আবাস ভূমে গমন করিলেন, তখন খোদার অভিপ্রায়, সেই মাঠের পার্শ্ব দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইল, দেখিলেন, তাঁহার সেই তছবি ছড়া সেই বৃক্ষের শাখার উপরেই ঝুলিতেছে। সওদাগর ইহা দেখিয়া পীরসাহেবের গুণময় চরণে শত শত প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং যে কোন গ্রামে বা সহরে যাইতেন, সেইখানেই এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া সমস্ত জনগণকে তাজ্যবের (আশ্চর্য্যের) নদীতে ডুবাইয়া দিতেন।

পদ্য।

তুমি হে ধর্ম্মরাজ, গুণময় পীর।
আদম গৌরব স্থল তনয় নবীর॥
দুঃখীর চক্ষের তারা আর হন যিনি।
মুরিদ সাহায্যকারী, বটে হন তিনি॥
প্রদীপ হয়েছ তুমি সকল জীবের।
আর পুষ্প হয়েছেন, জগৎ বাগের॥
তব নামে দুঃখ দূর হয় সবাকার।
খোদার নামের মত, ফল হয় সার॥
বাঞ্ছাপূর্ণকারী তুমি, হও জীবেদের।
মন ক্ষেত্রে রাখ ফল গুণেতে নিজের॥
আহা রে পাপিষ্ঠ রিপু, ধরেছে আমায়।
বিলাস জালেতে, পদ বদ্ধ হচ্ছে তায়॥

এই বক্তৃতা শুনিয়াই সকলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ স্বর্গ পাইবার পাত্র হইতেছে। উনিও সেই সঙ্গে বসিয়া, পীরসাহেবের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনিতে থাকিলেন। কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার মলের (পায়খানার) এতই প্রবল বেগ হইল যে, তাহা সম্বরণ করা একেবারেই কঠিন হইল। আবার সেই ফলদাতার বক্তৃতার সভা হইতে যাইতেও আদৌ ইচ্ছা হয় না। কাজেই তাঁহার মনে অবর্ণনীয় কষ্ট হইল। সুতরাং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এখন আর উপায় কি। এই ভাবিয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। খোদার করুণা বুঝিতে পারে কে? হঠাৎ পীরসাহেবের দৃষ্টি সওদাগরের উপর পড়িল, তিনি সওদাগরের মনের বেদনা জানিতে পারিয়া আপন মেম্বর হইতে উঠিয়া, নিজের চাদর সওদাগরের শীরে দিয়া, পুনরায় আপন মেম্বরে চড়িয়া বক্তৃতা করিতে লাগি-লেন। ওদিকে সওদাগরের শীরে চাদর দেওয়া মাত্রই দেখেন, তিনি কোনও নদীর তীরে একটী বৃক্ষের পাশে, দণ্ডায়মান আছেন। মলের বেগ প্রবল থাকায় তাড়াতাড়ি তছবি ছড়া বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া দিয়া বাহ্যে ফিরিতে বসিল, পরে ঐ নদীর জলে জলশৌচ ও ওজু করিয়া সভার দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তছবি ছড়া লইবার কথা স্মরণ হইল না, সুতরাং তাহা বৃক্ষশাখাতেই রহিয়া গেল। সওদাগর যেমন কিছুপদ অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, যে তিনি সেই সভায় নিজের পূর্ব্বস্থানে বসিয়া আছেন। তখন তিনি স্থিরমনে ও মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। পরে সভা ভঙ্গ হইলে, উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে এই ঘটনা প্রকাশ করিলেন। যিনি এই কথা

তেমন রূপী বাগানের সমস্ত ফুল প্রস্ফুটিত হইত, এবং সেই প্রণয়রূপী মদ্যে মত্ত হইয়া অজ্ঞান হইত। এমন কি, কেহ কেহ সেই অজ্ঞান অবস্থায় প্রিয়প্রাণ প্রাণদাতাকে অর্পণ করিত। আর চারিশত লোক তাঁহার উপদেশবাক্য লিখিত, সেই বাক্য এতই উৎকৃষ্ট হইত যে, লেখনিও ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার উপদেশে আর একটী আশ্চর্য্যশক্তি ছিল, তাঁহার বাক্য দূরবর্ত্তি ও নিকটবর্ত্তি জনগণ সমান ভাবে শুনিতে পাইত। স্থানের বিভিন্নতা জন্য শ্রবণের কোনও ব্যতিক্রম ঘটিত না। আহা! যিনি পার সাহেবের পবিত্র বচনে এমন গুণ অর্পণ করিয়া ছিলেন, সেই দয়াময় খোদাতালা নিশ্চয়ই অশেষ গুণী ও মানী। বচন ইহাকেই বলে, আর মাধুর্য্যের মানেও ইহাই হয়।

বড় পীর দয়া কর, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ, আমায় ॥

একটী সওদাগর পীরসাহেবের ক্ষমতা দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, তাহার বিবরণ।

কথিত আছে, কোনও সওদাগর কোনও স্থান হইতে কোনও স্থানে যাইতে ছিলেন। যখন তিনি বোগদাদ নগরে পৌঁছিয়া বড় পীরসাহেবের বক্তৃতার মাধুর্য্যের কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারও শুনিবার ইচ্ছা হইল, কাজেই তিনি সে দিবস সেইস্থানেই থাকিলেন। পরদিন পীরসাহেবের বক্তৃতার সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, সেই পূর্ণিমার চন্দ্র বড় পীরসাহেব মেম্বরে চড়িয়া বক্তৃতা করিতেছেন, এবং বহুসংখ্যক লোক, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া শ্রবণ করিতেছে। আর তাঁহার

সাহেবের (তাঁহার পর খোদা দয়াবারি বর্ষণ করুন) মান্য রাখিবার জন্য একবার কম করিয়া ফুঁ দিলাম। এই বলিয়াই তিনি আমার দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেলেন। তদবধিই আমার মুখ খুলিয়া গেল; এবং উপস্থিত জনগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম। এই ঘটনার পর হইতেই এত লোকের সমাগম হইতে লাগিল যে, মসজিদে স্থানের সঙ্কুলান হইল না, তখন ইদের মাঠেই মেম্বর রাখা হইল। পীর আবদুল্লা হবাই (তাঁহার উপরে খোদাতালার দয়া রন) তিনি বলিতেছেন, ভাইরে, বড়পীর সাহেবের সভায় প্রায় সত্তর হাজার লোক উপদেশ শ্রবণার্থ উপস্থিত থাকিত; আর আরোহী লোক এত আসিত যে, তাহাদের ঘোড়ার পায়ের ধুলায়, মাঠের চতুঃপার্শ্বে একটা দুর্গের প্রাচীরের ন্যায় বোধ হইত।

বড়পীর কর কৃপা, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেবের বক্তৃতায় কেমন ফল হইত, তাহার বিবরণ।

আখিয়ারুল সংবাদপত্রের সম্পাদক সাহেব লিখিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের গুণময় কথায় অতি উত্তম ফল ফলিত। যখন তিনি শাস্ত্রীয় প্রবচনের (আয়তের) অর্থ বর্ণন করিতেন, তখন শ্রোতাগণ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত, এবং মুখের রং পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, বোধ হইত যেন, মুখের উপরে প্রবল বায়ু ঘুরিতেছে। আবার যখন খোদার দয়ার প্রবচনার (আয়াতের) অর্থ বর্ণন করিতেন, তখন শ্রোতাগণের মনে এমন উল্লাস হইত যে,

মঙ্গলবার দিবস, হজরত পয়গম্বর সাহেবকে (তাঁহার উপরে খোদাতালা দয়াবারি বর্ষণ করুন) স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে বলিতেছেন, হে পুত্র! তুমি বক্তৃতা করনা কেন? আমি উত্তর দিলাম, সাহেব! দেখুন, আমি পারস্যদেশীয় পারস্যভাষী লোক, সুতরাং বোগদাদের আরব্যভাষী বিচক্ষণ বিদ্বান লোকের সম্মুখে কিরূপে বক্তৃতা করিব? শুনিয়া জোনাব পয়গম্বরসাহেব বলিলেন, তুমি হাঁ কর। তাঁহার আজ্ঞামত হাঁ করিলে, তিনি কি মন্ত্র পড়িয়া আমার মুখের মধ্যে সাতবার ফুঁ দিলেন। তৎপর আদেশ করিলেন, তুমি সকলকেই বক্তৃতা শুনাইও। খোদার অভিপ্রায় বুঝে কে? সেই দিন জহরের নামাজের পরে, মসজিদে আমাকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আমি কোন কথাই বলিতে পারি না, আমার মুখ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এমন কি, একটী অক্ষরও উচ্চারণ করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমি সাতিশয় চিন্তাকুল ছিলাম, দৈবাৎ দেখি, আমার গুণময় দাদা আমিরুল মুমেনিন আলি মুরতুজা (তাঁহার উপরে খোদা সদয় রন) আমার সম্মুখে উপস্থিত। তিনি বলিতেছেন, হে! হোসেনের চক্ষুতারা! হে হোসায়েনের হৃদয়ের ধন! তুমি কথা বল না কেন? আমি নিবেদন করিলাম, দাদাসাহেব! আমার যে মুখ বন্ধ হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মিঞা, তুমি মুখ খোল (হাঁ কর), আমি তৎক্ষণাৎ হুকুম মান্য করিলাম। তিনি আমার মুখে ছয়বার ফুঁ দিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তখন আমি নিবেদন করিলাম, দাদাসাহেব! আপনি কেন সাতবার ফুঁক দিলেন না? তিনি উত্তর দিলেন, বাপুহে, আমি পয়গম্বর

উচ্চ হতে নিম্নে আসি হয়েছি পতন।
লউন আমার তত্ত্ব, হতেছি দাহন॥
সঙ্গী নাই, বল নাই, হই নিরুপায়।
প্রকাশিব মনোদুঃখ, শকতি কোথায়॥
রসে টসে, মন আসি, করেছে বন্ধন।
দেখিনা উপায় আর কখন রক্ষণ॥
কান্নাকাটী দুঃখ কষ্ট করিনু তামাম।
আহা রে! রক্ষার তবু, হলনা আঞ্জাম।
ওহে পীর তুমি ছাড়া, কে আছে আমার।
করিব নালিশ গিয়া, নিকটে যাঁহার॥
মুহূর্ত্তে জগত কাজ করহ রক্ষণ।
মোর জন্য, এত গৌণ কিসের কারণ॥
তোমারই খাই মোরা ওহে মম পীর।
দেখহ মুরিদ সব, হয়েছে অস্থির॥
নিজ শির দিনু ধরে, নজর তোমার।
বড়পীর কর দৃষ্টি, দিকেতে আমার।
ইহা শুনি যদি কৃপা, হয় উপজয়।
পাইবে অসীম মান্য কালেতে উভয়॥
বড়পীর কর দয়া, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়।

পীরসাহেবের বক্তৃতা আরম্ভ করার বিবরণ।

পাঠকগণ শ্রবণ করুন, নিজে পীরসাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করার কারণ এইরূপ বলিয়াছেন, বৎস্য! আমি পাঁচশত একুইশ হিজরী সনে, সওয়ালের চন্দ্রের ষোলই তারিখে,

কথা শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, ভয়ে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, হুজুর! আপনি ত আপনার মাতার হুকুম মত কার্য্য করিলেন, তাঁহার কথা অমান্য করিলেন না, কিন্তু বলুন দেখি, আমার কি উপায় হইবে? আমি সেই ধরাপাতা, খোদাতালার হুকুম অমান্য করিয়া তাঁহার সৃজিত মানবগণের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাদের ধন হরণ করিয়াছি, আমি এখন কি করি? এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে চরণে পড়িয়া, আমার হাতে হাত দিয়া নিজের পাপের পরিতাপ (তোবা) করিলেন। তাহার সঙ্গীরা ইহা দেখিয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখুন, লুণ্ঠনকার্য্যে আমরা আপনার সঙ্গী ছিলাম, এখন পুণ্য কর্ম্মেও আপনার পশ্চাৎগামী হইব। তখন তাহারা সকলেই তোবা করিল, মুরিদ হইল, এবং বণিকদিগের যে সকল দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াছিল, তৎসমস্তই ফিরাইয়া দিল। কথিত আছে যে, সেই দস্যুপতির নাম আহম্মদবুদ্বুবী, তিনি তোবা করিয়া, পীর সাহেবকে নিজালয় লইয়া গেলেন, এবং বহুযত্নে আহারাদি করাইয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেন, অবশেষে অনেক কান্দাকাটী করিয়া, নিজের দুহিতাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার প্রার্থী হইলেন। পীর সাহেবও বিবাহে সম্মতি দিলেন, এবং নিজ সহবাসে সেই ভাগ্যময়ী বিবিকে, অতুল ভাগ্য ও গুণ দান করিলেন।

প্রার্থনা।

বড়পীর আনিলাম নিকটে তোমার।
অক্ষম লেখনী এই চালিয়া আমার॥

আর ধনরক্ষার জন্যও তিনি যথেষ্ট উপকারী; আর সমস্ত প্রশংসাই সেই খোদাতালার জন্য করি।”

তৎপর পুণ্যময়ী মাতা সাহেবানীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া একদল বণিক যাত্রীসহ বোগদাদ সরিফে গমন করিলাম। যখন হামদান হইতে দলটী অগ্রগামী হইল, তখন ষাট্‌জন অশ্বারোহী (ঘোড় সওয়ার) দস্যুরা বণিকদের দলের মধ্যে পড়িয়া লুঠতরাজ করিয়া সকলেরই ধনাদি লইতে লাগিল। আমি বিপদ দেখিয়া সেই দোয়াটী যাহা আমার দয়াময়ী মাতা সাহেবানী শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে লাগিলাম। এ জন্যই দস্যুরা আমাকে কিছু বলিল না। লুণ্ঠন শেষ হইলে পর, একটী দস্যু আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাপুহে! তোমার নিকটে কিছু আছে কি? আমি আমার মাতার আদেশ মত বলিলাম, হাঁ, চল্লিশটী আশরফি আমার সঙ্গে আছে। সে বলিল, তাহা কোথায় রাখিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার জামার মধ্যে বগলতলায় ঝুলিতেছে। সে, এই কথাটী মিথ্যা বিবেচনা করিয়া সোজাসুজি চলিয়া গেল, পরে অপর একজন দস্যু আসিয়া, আমাকে ঐমত জিজ্ঞাসা করিলে, আমিও তাহাকে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলাম। শেষ কথা, তাহারা উভয়ে আমাকে দস্যুপতির নিকটে লইয়া গেল। দস্যুপতি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও পূর্ব্বের মত উত্তর দিলাম। তিনি আমার জামাটী খুলিয়া যখন ঐ মোহরগুলী পাইলেন, তখন সাশ্চর্য্যে বলিলেন, তুমি নিজ ধন গোপন না করিয়া প্রকাশ করিলে কেন? আমি বলিলাম, সাহেব! আমার মাতা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না!

হইলাম, এবং বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মনে প্রবল ইচ্ছা হইল, তাই সেই সময়ই নিজের গুণময়ী ও দয়াময়ী মাতা সাহেবানীর পুণ্যময় সেবাতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম, মা! আমাকে হুকুম দেন, আমি বোগদাদ সরিফে যাইয়া বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান উপার্জ্জন করি, এবং দরবেশ সাহেবদের সঙ্গে সদা সর্ব্বক্ষণ থাকি। আমার গুণময়ী মাতা সাহেবানী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, বাবা, তুমি কি জন্য আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাও, আর এই ইচ্ছাই বা তোমার কেন হইল? তখন আমি যাহা দেখিয়া ছিলাম, তৎসমস্তই মাতা সাহেবানীর নিকটে নিবেদন করিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া কত কান্দিয়া ছিলেন, পরে ৮০ আশীটী মোহর আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, বাবা, তোমার পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যে মাত্র এই কয়টী আশরফি আমার নিকট আছে। ইহার চল্লিশটী আশরফি তোমার ভাই আবুআবদুল্লা আহাম্মদের অংশ, অপর চল্লিশটী মোহর তোমার নিজের, প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সঙ্গে লও। এই বলিয়া মোহরগুলী জামার পার্শ্বে ভরিয়া সেলাই করিয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন, বাবা! সদা সত্য কথা কহিবে, কখন মিথ্যা কহিও না। যদি কোন বিপদে পড়, তবে এই দোয়াটী একশত বার পাঠ করিও, তোমার সেই বিপদ আপদ ঘুচিয়া যাইবে।

দোয়াটীর বাঙ্গালা তরজমা এই—

"খোদাই আমার রক্ষার জন্য যথেষ্ট, তাঁহার আদেশও আমার রক্ষার জন্য যথেষ্ট, সমস্ত জীবরক্ষার জন্য যথেষ্ট বটে, তিনি উপকারীর পক্ষেও যথেষ্ট উপকারী ও গুণী,

কাতারে কাতারে উপস্থিত দেখিয়াছি। বড় পীরসাহেব সদাই বলিতেন, মিঞা! আমি পরিধান করি না, খোদা-তালা নিজে যে পর্য্যন্ত আমাকে পরিধান না করান। এবং আহার করি না, যে পর্য্যন্ত তিনি নিজে আমাকে আহার না করান।

বড় পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

বড় পীরসাহেবের বোগ্দাদ যাত্রার বিবরণ।

কোন কোন গ্রন্থে বড় পীরসাহেবের গিলান হইতে বোগ্দাদে আগমন ও ওয়াজ আরম্ভ করার কথা, এইরূপ লেখা আছে। পীরসাহেব নিজে বলিতেছেন, আমি যুবা-কালে হজের দিবস নিজের গাভীটী রাখার জন্য মাঠে যাইতে ছিলাম। হঠাৎ দেখি, গাভী মুখ ফিরাইয়া বলি-তেছে, হে বড় পীরসাহেব! আপনি হোসেনের বাগানের উত্তম পুষ্প, এবং হোসায়েনের বাগানের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য; সুতরাং স্বয়ং খোদাতালা আপনাকে এই কাজের জন্য সৃজন করেন নাই, বরং তিনি আপন কাজ সাধিবার জন্য আপনাকে করিয়াছেন। আমি সেই গাভীমুখে বাক্য নিঃসরণ হইতে শুনিয়া কিছু ভীত হইলাম। অমনি সেখান হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে ছাদের উপরে উঠিলাম, দেখি, পথটী যেন সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না, আর ফার পর্ব্বতটী সম্মুখে দেখা যাইতেছে, এবং হাজিরা যে তথায় হজ করিতেছে, তাহাও স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমি এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া মনে মনে বড়ই উল্লাসিত

৬০ জন দস্যু তাঁহার পবিত্র হস্তে পরিতাপ (তৌবা) করিয়া, নিজের ব্যবসা হইতে বিরত হইয়া, তাঁহার মুরিদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তৎপর পাঁচশত একুশ হিজরী সনে, মহাত্মা পয়গম্বর সাহেবের আদেশে ও আমিরুল মোমেনিন আলি মুর্ত্তজার আজ্ঞাতে নিজের মুখের জল তাঁহার পবিত্র মুখে প্রদান করায়, তিনি মেম্বরে আরোহণ করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। তারপর তিনি সদাই ওয়াজের সভা করিতেন।

তাঁহার পরিধান জামাও মৌলবী সাহেবদের জামার মত ছিল। স্মরণ রাখিবেন, তিনি যে কাপড় পরিতেন, তাহার প্রত্যেক গজের মূল্য এক আশরফিরও অধিক। আর উপদেশের সময় তিনি বলিতেন, হে বিশ্ব জগতের লোক (মনুষ্য ও ফেরেস্তা), তোমরা সকলে উপস্থিত হও, আর আমার কথা শুন, এবং আমা হইতে কিছু শিক্ষা কর। কেন না, আমি এখন ধর্ম্মপ্রচারক; মহাপুরুষের (তাহার পর খোদাতালা দয়া বারি বর্ষণ করুন) নায়েব হই, আর তাঁহার সভাতে প্রায় সত্তর হাজার লোক উপস্থিত হইত; এবং প্রায় চারিশত লোক তাঁহার উপদেশ বাক্য লিখিত। এই বাক্যের এতই গুণ যে, তাহাতে সভাস্থ সমস্ত লোকই অজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া পড়িত, এমন কি, কেহ বা সেই আস্বাদেই প্রিয় প্রাণ, প্রাণসৃজনকারীকে অর্পণ করিত। সেখ আবুসাইদ কিলুবী সাহেব, তার উপরে খোদাতালা বড় সদয়, বলেন যে, বড় পীরসাহেবের ওয়াজের সভাতে আমি সদাই পয়গম্বর সাহেবকে (তার উপরে খোদাতালা দয়া বারিবর্ষণ করেন) ও অন্যান্য পয়গম্বর ও জিন এবং ফেরেস্তাদিগকে,

লোক, তথায় উপস্থিত হইয়া ফেরেস্তাদের শব্দ শুনিয়া আমার দিকে ইসারা করিয়া ছাত্রদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! এই ছেলেটী কে? ছাত্রেরা উত্তর করিল, সাহেব! আপনি ইহা জিজ্ঞাসা করেন কেন? তিনি বলিলেন, বাপুহে! মনে রেখ, এই ছেলেটী বহু উচ্চ পদে আরোহণ করিবেন। কেন না, ইনি বিনা কষ্টেই খোদার দর্শন পাইবেন, এবং খোদার নিকটবর্ত্তী হইবেন (প্রিয় হইবেন)। আমি কিন্তু সেই সময় তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তবে চল্লিশ বৎসর পরে জানিতে পারিলাম, তিনি সেই সময়ের সর্ব্বপ্রধান সাধু ছিলেন।

বড় পীর দয়া কর, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ, আমায়॥

পীরসাহেব বোগদাদ নগরে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবার বিবরণ।

সুফিনাতুন আওলিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুষ্প, এবং পুষ্পরক্ষাকারী উদ্যান ও সাধুরূপী নদীর সম্রাট, মহাত্মা গৌসে সাকেলিন, ১৭ সতের বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বর্গসম গিলান ভুমি আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে (চারিশত অষ্টআশি হিজরী সনে) তিনি বোগদাদে শুভাগমন করেন এবং বিদ্যাধ্যয়নে মগ্ন হন; এমন কি, পবিত্র কোরাণ কণ্ঠস্থ করা, পরে অল্প দিনেই ফেকা ও হদিস্ এবং সর্ব্ব প্রকার উৎকৃষ্ট বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া, সমপাঠীদের স্থলে, অতুলনীয় হইয়া, সেই সময়ের সর্ব্ব প্রধান বিদ্বান ও ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া পড়েন। ইহার পূর্ব্বে

লক্ষ সূর্য্যতাপেও আমাকে কিছু করিতে পারিবে না, বরং ঐ সব আলোক আমার হৃদয়মধ্যে লীন হইয়া যাইবে।

পদ্য।

মুহূর্ত্তে করিল মত্ত মন্ত্রেতে তাহার।
পুষ্পগন্ধে পৃষ্ঠ নত করিল আমার॥
নিজে এবে হচ্ছি সুরা, মত্ত হব কেন।
নিজে পুষ্প হচ্ছি, গন্ধ কেবা আনি দেন॥
বড় পীর দয়া কর, মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পীরসাহেব ঈশ্বরপ্রিয় হইবার বিবরণ।

পাঠকগণ শ্রবণ করুন। সেই স্বর্গসম মর্য্যাদাময়, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আশ্চর্য্য গুণ প্রকাশিত, স্বর্গীয় দেবেরা যাঁহার স্থানে নত, প্রকাশ্য ও গোপনীয় ধর্ম্মরাজ্যের সিংহাসন যাঁহার আসন, তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে! সরিয়তের (প্রকাশ্য ধর্ম্মের) ও তরিকতের (গোপনীয় ধর্ম্মের) সম্রাট! আপনি কোন্ দিন হইতে আপনাকে খোদার বন্ধু বলিয়া জানিয়াছেন? তিনি কহিলেন, ভাই! যখন আমার বয়ঃক্রম দশ বৎসর ছিল, তখন আমি বিদ্যালয় যাইতাম। সেই সময় দেখিতাম, ফেরেস্তা (দূতেরা) শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া আমার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে। তৎপরে যখন আমি বিদ্যালয় পঁহুছিলাম, তখন তাহারা উচ্চরবে বলিল, হে জনগণ! তোমরা খোদার বন্ধুর জন্য স্থান প্রসর় কর। এমন কি, একদিন একটী অপরিচিত

পীরসাহেব সূর্য্যের স্থানে আরোহণ করার বিবরণ।

পাঠকগণ! কোন কোন গ্রন্থে এরূপ লেখা আছে যে, বড় পীরসাহেব শৈশবে একদিন ধাত্রী মাতার কোলে নিদ্রা যাইতেছিলেন, হঠাৎ উধাও হইয়া সূর্য্যের স্থানে আরোহণ করেন; তখন তাঁহার পবিত্র দেহ পারদের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। ধাত্রী এই অসম্ভব ঘটনা দর্শনে যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একদৃষ্টে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এমন সময় পীরসাহেব সূর্য্যমণ্ডলী হইতে সুস্থশরীরে নামিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিলেন। ধাত্রী মাতা এই ঘটনাটী অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, আপন মনেই রাখিলেন। পরে যখন পীর সাহেব বোগদাদসরিফে উপদেশী সিংহাসনে আসীন হইয়া শুভাশুভ উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ ধাত্রী মাতা গিলান হইতে বেগে বোগদাদে আসিয়া নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধুদের সম্রাট! হে খোদাতালার পরিচিত প্রাপ্তির বিরাট উদ্যান! শৈশবে আপনি আমার পার্শ্ব হইতে উধাও হইয়া নিজের আলোতে সূর্য্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন, এখন আর সেরূপ ঘটনা হয় কি না? পীরসাহেব কহিলেন, দয়াময়ী ধাত্রী মাতা! এ রহস্য গোপনীয়। আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালাকে ধন্য-বাদ প্রদান করি, কেন না, এখন আমার উপর তাঁহার দয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। শৈশবে সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে অপারক হইয়া পারদবৎ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলাম, এখন সেই পরম কারুণিক খোদাতালা আমাকে এত শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, ঐ মত লক্ষ

পীরসাহেব শৈশবে খোদার আদেশ শুনিতেন না,

তাহার বিবরণ।

পাঠকগণ! বড় পীরসাহেব কি বলিতেছেন শুনুন; শৈশবে যখন নিদ্রা যাইতাম, তখন প্রায়ই শুনিতাম, "আবদুল কাদের! নিদ্রা যাইবার জন্য আমি তোমাকে সৃজন করি নাই, আমাকে চিনিয়া, আমার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্যই তোমাকে সৃজন করিয়াছি।" আবার যখন সঙ্গীদের সহিত খেলা করিতাম, তখনও শুনিতে পাইতাম, "হে প্রিয়! আমার দিকে আইস।"

অন্য দিকে কেন ধাও ওহে মম প্রাণ।
মোর দিকে এলে পরে পাবে বহু মান॥

আমি ইহা শুনিয়া অবধি, খেলা ছাড়িয়া গুণময়ী ও দয়াবতী মাতা সাহেবানীর নিকট থাকিতাম, এবং ইহাতে যে কত আনন্দ পাইতাম, তাহা আমি আর আমার মনই জানে।

এই সাধু ছেলে কেবা, দেখ গুণময়।
চাঁদ সম মুখ, বাক্ মধু সম হয়॥
স্বর্গবাণী সর্ব্বক্ষণ হয় এ প্রকার।
ওহে প্রিয় এস তুমি দিকেতে আমার॥
ওহে পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

অদ্য রোজা রাখিবে কি না। ইহাই ভাবিতে ছিলেন। দৈবাৎ আমার পরশীর একটী মেয়েলোক্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন ত শুনি, আপনি কি আজ কোনস্থান হইতে চন্দ্র উদয়ের খবর পাইয়াছেন? আমি তাকে জবাব দিলাম, না, আমি চন্দ্র উদয়ের কোন খবর পাই নাই। কিন্তু আমার এই পুত্রটী শ্রীমান্ আঃবদুল কাদের জিলানী, তাহার উপরে খোদাতালা রাজি হন। আজ দুগ্ধের দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করে না। কাজেই আমার অটল ধারণা এই যে, অদ্যকার দিন নিশ্চয়, পবিত্র রমজান সরিফের দিন হইবে। এখানে এই সব কথা হইতেছিল, ওদিকে চতুষ্পার্শ্ব হইতে ঘন ঘন খবর আসিতে লাগিল, আজ চন্দ্র উঠিয়াছে, এবং একেবারে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গেল যে, নিশ্চয় সেই দিন রমজান সরিফের বটে। তারপর সমস্ত সহরে ধূম লাগিয়া গেল। দেখুন, অমুক পবিত্র ও দয়াল বংশে এমন এক ভাগ্যময় শিশু জন্ম লইয়াছে যে, তিনি অতি শিশুকালেও রমজান সরিফের রোজা রাখেন।

পদ্য।

হয়েছে যাহার ভাগ্য অতি গুণময়।
পূর্ব্ব হতে সেইজন এইমত রয়॥
এইত দৃষ্টান্ত লোকে করেন বর্ণন।
ভুমিগুণে ফল হয় মনের মতন॥
বড়পীর কর দয়া মোরা নিরুপায়।
ধর্ম্মের রক্ষক রক্ষা করহ আমায়॥

পদ্য।

ওহে পীরদীপ্তিকারী গৃহটী সাঁলের।
তব মুখ আলোকিত সমান চাঁন্দের ॥
সর্ব্বদিক উজ্জ্বলিত আলোতে তোমার।
দীপ্তিমান ছিলে তুমি রাত্রে অন্ধকার ॥
হোসেন বাগানে পুষ্প তোমার কারণ।
হোসায়েন জন্য তুমি রত্নের সৃজন ॥
সমস্ত জগৎ আলো কারণে তোমার।
কেন না তোমার বাক্ দেবের আকার ॥
মাতঃ পার্শ্ব হতে গেলে স্থানেতে সূর্য্যের।
সূর্য্যও তোমার মান্য করেছেন ঢের ॥
আর যবে বিদ্যালয়ে করিতে গমন।
আগে পাছে রৈত তব যত দেবগণ ॥
যুবাকালে মুখ যিনি দেখেছে তোমার।
মনে মুখে হছে তিনি তোমারি সীকার ॥

পীর সাহেব শিশুকালে রোজা রাখেন, তাহার বিবরণ।

বড়পীর সাহেবের গুণময়ী মাতা সাহেবানী বলিতেছেন যে, পীরসাহেব শিশুকালেও রমজান সরিফের রোজা রাখিতেন; কোনও দিন দিবসে দুগ্ধ খাইতেন না। এমন কি, একবার সাবানের ২৯ উনত্রিশ তারিখে আকাশে মেঘ থাকার জন্য চন্দ্র কাহারও নয়নগোচর হয় নাই; সেই জন্য প্রাতঃকালে তথাকার অধিবাসীরা চিন্তাকুল ছিলেন,

বড়পীর সাহেবের জন্ম লইবার বিবরণ।

মনে রাখিবেন, পীর সাহেবের তনয় হজরৎ মৌলানা আবদুল রেজাক্ সাহেব বলিয়াছেন, যখন ভুবনময় আলোকিত আলোরূপী বীর্য্য (নুর) হজরত গৌসে আজম্, আপন পিতার পৃষ্ঠ হইতে আপন মাতার গর্ভে গমন করেন, তখন তাঁহার গুণময়ী ও দয়াময়ী মাতা সাহেবানী বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, বয়ঃক্রম ষাটী বৎসরে উঠিয়াছিল, আর এই কালটী ছিল একেবারে নিরাশের কাল। কিন্তু, তিনি নিজের গুণে, নিজ মাতাকেও গুণী ও অমূল্যরত্ন অর্পণ করিয়া ছিলেন। কেন না, তিনি যে, গুণে চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। আবার তাঁহার গুণময়ী মাতা সাহেবানীও বড় দরের দরবেশ হইয়াছিলেন। আহা! যাঁহার গুণে বিশ্বজগতের সমস্ত জীবই গৌরব করে, তাঁহার পবিত্র জন্ম, ৪৭১ চারি শত একাত্তর হিজরী সনে, স্বর্গসম মাননীয় গিলান ভুমে, পবিত্র রমজান সরিফের প্রথম তারিখ ছিল। তিনি খোদার প্রিয় ও পয়গম্বর সাহেব তাঁহার উপরে সদয়, আর যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহার কায়া দিয়া, সদাসর্ব্বদা কেরামত (গুণাগুণ) প্রকাশ হইতে লাগিল। আর তাঁহার কায়ার বিবরণ, প্রধান প্রধান কেতাবে এইরূপ লেখা আছে যে, তিনি দুর্ব্বল কায়, মধ্যম আকার, শিনা কোসাদা, কপাল খোল্লা, গধুম রঙ্গ, পেস্তা আবরু ছিল। আর সুর ছিল উচ্চ, মুখে ছিল খোদার নুর। যে ব্যক্তি ঐ নুর কোন সময় দেখিতে পাইতেন, তিনি বেহুষ হইয়া যাইতেন।

হইলেন। আমরা এখন সেই জগৎপাতা খোদাতালার বিশেষ প্রশংসা করি ; কারণ তিনি এমন উৎকৃষ্ট পীরের দাসের মধ্যে আমাদিগকে পরিগণিত করিয়াছেন, এবং সেই পীরের মুরিদ মধ্যে আমাদিগকে স্থির করিয়া দিয়াছেন।

পদ্য।

সম্রাট্ জিলানী প্রেমে, সঁপ মনপ্রাণ।
তাঁর হাত ঈশ হাত, জানিহ নিদান॥
দুঃখিরক্ষাকারী তিনি সম্রাট্ প্রধান।
খোদা নবিপ্রিয় আর শুনহ বিধান॥
অতুল্য সম্মান তাঁর বাক্যে গুণ অতি।
কাজ কর্ম্ম দেবসম শুনি তাঁর গতি॥
সাধুগণ বড় হয় পাইলে চরণ।
কেন না ধর্ম্মের তিনি অমর জীবন॥
হোসায়েনী বংশ তিনি রূপে চন্দ্রময়।
ইসুফ হইবে দাস আশ্চর্য্য তা নয়॥
রজনী উজ্জ্বল হয় রূপেতে তাঁহার।
মুরিদেরা পায় রক্ষা কারণে ইহার॥
দেবেরা আর্দ্দালী প্রায় ধায় অগ্রে তাঁর।
নবিগণ মান্য তাঁর করেন অপার॥
দুঃখী প'রে দয়া করি করেন অর্পণ।
তাঁহার দ্বারেতে দুঃখী সম্রাট্ অগণন॥
মান্য তাঁর স্বর্গ হইতে হয় অবতীন।
নেঘাবানি জন্য আসে জিবরিল আমিন॥

প্রথম অধ্যায়।

বড়পীর সাহেবের সজরার বিবরণ।

পাঠকগণ! এই কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, আবার বড়পীর সাহেবের মাতার নাম বিবি ফাতেমা ১। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবদুল্লা মুসা ২। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবুল জামাল ৩। তাঁহার জনক সৈয়দ মহাম্মদ ৪। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আহাম্মদ ৫। তাঁহার বাপের নাম সৈয়দ তাহের ৬। তাঁহার বাপের নাম সৈয়দ আবদুল্লা ৭। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ কামাল ৮। তাঁহার জনক সৈয়দ আলী ৯। তাঁহার জনক সৈয়দ আলাউদ্দিন ১০। তাঁহার জনক সৈয়দ মহাম্মদ ১১। তাঁহার জনক সৈয়দ এমাম জাফর সাদেক ১২। তাঁহার জনক সৈয়দ এমাম মহাম্মদ বাকের ১৩। তাঁহার জনক সৈয়দ এমাম জয়নাল আবেদিন ১৪। তাঁহার জনক এমাম হোসায়েন ১৫। তাঁহার জনক হজরৎ আলি মুরতজা ছিলেন ১৬। ইহাঁদের সকলের উপরেই খোদাতালা সদয় থাকুন। আবার আবদুল্লা মহজের দয়াময়ী মাতা সাহেবানী সহিদে কারবালা মহাত্মা এমাম্ হোসায়েনের দুহিতা মহামতি শ্রীযুক্তা ফতেমা নাম্নী ছিলেন; ইহাদের সকলের উপরেই, খোদাতালা সদয় আছেন।

আবার পরে, বড়পীর সাহেবের মাতার বংশও হোসায়েনী ছিলেন। কাজেই তিনি হোসেনের বাগানের উৎকৃষ্ট পুষ্প এবং হোসায়েনের উদ্যানের মনোহর সৌন্দর্য্য

কেরামতও বটে। কেন না, তিনিও যে খোদার প্রিয় ও মুরিদের উপর সদয়, এবং পদে পদে নবি সাহেবের সঙ্গে তাঁহার ঐক্য হয় (বংশধর জন্য)। এখন বলুন, তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিতে কাহারও কি শক্তি আছে ?

কিন্তু এইজন্য যখন দরবেশ সাহেবদের গুণাগুণ ও চরিত্রাদি বর্ণন করা যায়, তখন খোদাতালার দয়া নাজেল হয়। অতএব পুণ্য পাইবার আশায় ও তাঁহার মুরিদের মধ্যে ভর্ত্তি হইবার অভিলাষে তাঁহার চরিত্র ও গুণাগুণ সহস্র হইতে এক, অনেক হইতে অল্প বর্ণন করা যাইতেছে। উহা তিন দ্বারে বিভাগ করা হইল। ১ম দ্বারে—সেই গুণময় বড়পীর সাহেব, যিনি মুক্তার সাগর, এবং সাধুদের মধ্যে মহামূল্য হীরার আকর। তাঁহার পবিত্র জন্ম ও উপাধি (লকব) ও হসব, নসব এবং পীরি সজ্‌রা ; আর সেই গুণাগুণ যাহা তাঁহার দ্বারা শিশুকালে প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ণনা করা গেল। ২য় দ্বারে—তাঁহার সরিয়তি ও মারফতি বিদ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ও কতক কতক গুণাবলী, যাহা তিনি সাধুর আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বে ও পরে, তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বর্ণনা করা গেল। ৩য় দ্বারে—উক্ত সাহেবের চরিত্রাবলী এবং নশ্বর জীবন ছাড়িয়া স্বর্গে আরোহণ, আর স্বর্গ আরোহণান্তে তাঁহার পবিত্র আত্মা দ্বারা যে যে গুণাগুণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বর্ণনা করা গেল।

পদ্য।

ঈশ্বরের আলো হয় আসন নবীর।
নবি জন্য হিরাময় আসন সুস্থির ॥

সেই পয়গম্বর সাহেবের উপরে ও তাঁহার বংশ, বন্ধু এবং আজ্ঞাধীন উম্মত লোকের উপরে খোদাতালার শত সহস্র দয়া সদা সর্ব্বদা বর্ষণ হউক।

পাঠক মনে রাখিবেন, ঐ সকল কথা গুপ্ত ও অপ্রকাশ্য নহে যে, সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালা অন্য প্রেরিত মহাপুরুষ-দিগকে যে সকল গুণাগুণ, শক্তি সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, সেই সমস্তই জগতের সর্দ্দার ও জীবগণের গৌরবের আকর ও শেষকালের প্রেরিত মহাপুরুষ এবং ইহ ও পরকালের কষ্টদুরকারী, আর পৃথিবীবাসী মাত্রেরই অসীম দয়ার আধার। যাঁহার শুপারিসী খোদার মঞ্জুর, তাঁহার নামই মহাম্মদে মজ্‌তবা, আহ্‌মদে মস্তফা (খোদা তালার দয়া, দান, তাঁহার উপরে সর্ব্বদা বর্ষণ হউক)। তাঁহার মধ্যেএই সকল গুণাগুণ একত্রিত আছে ; তাহা ছাড়া আরও গুণময় তাজ ও সাক্ষাৎরূপী মেয়ারাজ দান করিয়াছেন। স্মরণ রাখিবেন, আবার দরবেশদের মধ্যে গুণময় বড়পীর সাহেবকে সর্ব্ব প্রধান দরবেশ করিয়াছেন। সেই পীর সাহেবের উপরে ও তাঁহার বংশধর বন্ধু বান্ধব এবং মুরিদদের উপরে, খোদা-তালা সদা দয়া করুন্। আর ইহাও স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত আছে, যেমন খোদাতালার সোকর গোজারী ও প্রশংসা এবং নবি সাহেবের গুণাগুণ বর্ণনা করা পৃথিবীবাসী কাহারও দ্বারা শেষ হইতে পারে না, সেই মতই বড়পীর সাহেবের

বড়পীর গুণাবলী।

ভূমিকা।

শুরু করিতেছি আমি নামেতে আল্লার।
অশেষ অপার দয়া সর্ব্বত্র যাঁহার॥

অনেকেই অনেকরূপ লেখনি চালাইয়া, সন্তুষ্টমনেই জগৎপাতা খোদাতালার নানা প্রকার প্রশংসা লিখিতেছেন। কেন না, খোদাতালা নিজের অসীমগুণে ও অসাধারণ ক্ষমতায়, জগৎরূপ বাগান নানারূপে রঞ্জিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ (পয়গম্বর) দিগকে নানাগুণে গুণী ও গুণরূপ পুষ্পহার তাহাদের কণ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া, কি অপরূপ সৌন্দর্য্য দিয়াছেন এবং স্থায়ী ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং সেই খোদাতালার মান্য সর্ব্বপ্রধান, ও তাঁহার দলিলগুলি অতুলনীয় বিধান।

এই গ্রন্থরূপ উদ্যানে সন্তুষ্টমনে লেখনি চালাইয়া পবিত্র মহাপুরুষ মহাম্মদের (দরুদ) উৎকৃষ্ট গুণাবলী বর্ণনা করা যাইতেছে। যিনি অন্য অন্য প্রেরিত পুষ্পরূপী মহাপুরুষদের উদ্যানস্বরূপ, এবং যিনি প্রকাশ্য ধর্ম্মের (সরিয়তের) ও গোপনীয় ধর্ম্মের (মারফতির) ভাণ্ডার তুল্য হইয়া জগতের মধ্যে নানারূপ শাস্ত্ররূপ সুগন্ধি পুষ্প বিতরণ করিয়া, ধরা মহাসুগন্ধে বিমুগ্ধ ও সৌন্দর্য্যে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় ব্যক্ত করা যাইতেছে।